Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পরিবারিক কাঠামোর উপর

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাইসা আমিনা

রোলঃ 23090121745

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পরিবারিক কাঠামোর উপর

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাইসা আমিনা

রোলঃ 23090121745

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পরিবারিক কাঠামোর উপর " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাইসা আমিনা, আইডিঃ 23090121745 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পরিবারিক কাঠামোর উপর ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Raisa Amina

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

রাইসা আমিনা

আইডিঃ 23090121745

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

মুসলিম পরিবারব্যবস্থা... 12

পশ্চিমা পরিবারব্যবস্থা 24

ইসলামী ও পশ্চিমা পরিবারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ 27

মুসলিম সমাজে পশ্চিমা প্রভাব বিস্তারের পথ ও কারণসমূহ.................................... 39

সমাধানের পথসমূহ 51

উপসংহার 67

পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব মুসলিম পরিবারিক কাঠামোর উপর

ভূমিকা

■ ইসলামী দৃষ্টিতে পরিবারের স্থান ও গুরুত্ব:

প্রাচীন কাল থেকে মানুষ কোন না কোন ভাবে সামাজিক জীবন যাপন করছে। আর সামাজিক জীবনে প্রাথমিক স্তর হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে পরিবার। সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সুখ সমৃদ্ধিতে ভরপুর সমাজ কাঠামো গঠনে পারিবারিক ব্যবস্থা ও মূল্যবোধের ভূমিকা অপরিসীম।

এছাড়াও মানবিক বিভিন্ন উন্নত ও নৈতিক গুণাবলীর বীজ বপণের সঠিক সময় হলো শিশুকাল। একটি মানব শিশু তার মানসিক ও সার্বিক প্রয়োজন পূরণে সম্পূর্ণ অক্ষম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। তখন শিশু একমাত্র এই পরিবারে বেড়ে ওঠার সময়কালে উন্নত গুণ ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারে। সুতরাং মানবিক ব্যক্তিত্ব গঠনে প্রধান ভিত্তি প্রস্তর হলো পরিবার।

তাই ইসলামও পারিবারিক জীবন ব্যবস্থাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং কোরআন-সুন্নাহর বিধি-বিধানের এক বৃহৎ অংশ জুড়ে রয়েছে পরিবার।

ইসলাম কখনো শুধু ব্যক্তিগত জীবনেই দ্বীন পালনের জন্য উৎসাহ দেয় না, বরং নিজে দ্বীন পালনের পাশাপাশি পরিবারের বাকি সদস্যদেরও তার তাগিদ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ۝

অর্থ: 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা কর অগ্নি হতে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম-হৃদয়, কঠোর-স্বভাব ফিরিশতাগণ, যারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে।' (সুরা তাহরিম,আয়াত-৬)

ইসলামের মূল লক্ষ্যই হলো সঠিক মুমিন ও দৃঢ় বিশ্বাসী মানুষ তৈরি করা, যারা আল্লাহ তায়ালাকে চিনবে এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তি লাভ করবে।

পরিবার আল্লাহ তাআলার এমন এক নিয়ামত যেখানে সারা বিশ্বে যদি ইসলাম পালন নিষিদ্ধ হয়েও যায়, তবুও ব্যক্তি তার পরিবারে ঠিকই ইসলাম পালন করতে সক্ষম। শিশু মননে ঈমানের বীজ বপন এবং ইসলামী মূল্যবোধ জাগ্রত করার প্রধান ভূমিকা পালন করতে পারে পরিবার। শিশুদের জন্য নববী শিক্ষার প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানই হলো পরিবার। আজকের শিশুরা যদি সঠিক ঈমানী চেতনা ও ইসলামী আদর্শে গড়ে ওঠে, তবে আগামী প্রজন্মে তারাই হয়ে উঠবে ইসলামের কান্ডারী।এছাড়াও স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের সদস্যদের মাঝে পরস্পর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকার ফলে পরিবারের মাঝে দ্বীনের দাওয়াত উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে। সুতরাং ইসলামের মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নে পরিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাই ইসলাম পরিবার গঠনের নির্দেশ দেয় এবং পরিবারের বন্ধনকে আরো শক্তিশালী ও মজবুত করতে কোরআন ও হাদিসে বহু বিধান নির্ধারিত করে দিয়েছেন।

■ বর্তমানে ইসলামী মূল্যবোধের বাস্তবতা:

সময়ের পরিক্রমায় সকল দেশের সমাজ ব্যবস্থায় নানা ধরনের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে চলছে। পরিবর্তন ঘটছে বিভিন্ন চিন্তাধারার মোড়। পুরনো রীতিনীতি ও ধ্যান-ধারণা ক্রমাগত বিলীন হয়ে নতুনত্বের উত্থানের মাধ্যমে চলছে এক গ্রহণ বর্জনের নিরন্তন চক্র। ফলে মানুষ প্রতিনিয়ত এমন সব দৃষ্টিভঙ্গির সম্মুখীন হচ্ছে,যেগুলোর সাথে পূর্বে কখনো পরিচয় ঘটেনি। যার দরুন মানুষের মাঝে সৃষ্টি হচ্ছে বুদ্ধিভিত্তিক অস্থিরতা।

আধুনিকতার নামে বাস্তবতা বিবর্জিত প্রকৃতি বিরোধী পদক্ষেপ, লাগামহীন ভোগ আর অবাধ স্বাধীনতার ভয়াবহ পরিণাম গ্রাস করছে সামগ্রিক সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোকে।

একই প্রভাব পড়ছে আমাদের ইসলামিক জীবন ব্যবস্থার উপরেও। আমাদের উপর ইউরোপীয় উপনিবেশ চলাকালীন তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং মুসলিমদের চরম উদাসীনতার ফলস্বরূপ মুসলিম উম্মাহ হারিয়েছে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মুসলমানের একটি প্রধান সমস্যা হল তারা ইসলাম যে একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা তা ভুলে,ইসলামের খন্ডিত চর্চা করছে। ফলে মুসলিম সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি জীবন থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা হারিয়ে যাচ্ছে। প্রথম বিশ্বের অন্ধ অনুসরণের ফলে মূলত মুসলিমরা আজ নিজেদের লক্ষ্য ও মঞ্জিল থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমাগত।

পরিবার সমাজ কাঠামোর প্রথম স্তর। যদি ব্যক্তি জীবন ও পরিবারে ইসলামের চর্চা হ্রাস পেতে থাকে তাহলে যে সমাজ এক সময় ইসলামী সুরক্ষার বলয়ে সুরক্ষিত ছিল তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর সমাজে ইসলাম না থাকলে, রাষ্ট্র থেকেও ইসলাম বিলীন হতে থাকবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে এ বিষয়টাকে খুব সুন্দরভাবে উম্মাহর সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি ﷺ বলেন,

‘ইসলামের বিধানগুলো একে একে নষ্ট হতে থাকবে। যখন একটা বিধান নষ্ট হবে, তখন মানুষ তার পরবর্তী বিধানটাকে নষ্ট করতে উঠেপড়ে লাগবে। সর্বপ্রথম যে বিধানটা নষ্ট হবে, সেটা হল-ইসলামী শাসনব্যবস্থা। আর সর্বশেষ যে বিধান টা নষ্ট হবে, সেটা হল-সালাত।’ [মুসনাদে আহমাদ]

খন্ডিতভাবে ইসলাম চর্চা যেমন আমাদের দুনিয়াতে করছে লাঞ্ছিত ও অধঃপতিত, ঠিক তেমনি আমাদের পরকালীন জীবনকেউ করছে ক্ষতিগ্রস্ত।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা বলেন:

اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰي اَشَدِّ الْعَذَابِ ؕ وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ

অর্থ: ‘তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো? সুতরাং,, তোমাদের মধ্যে যারা তা করে, দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কি প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আজাবের নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন’। (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৮৫)

■ পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব ও গবেষনার প্রয়োজনীয়তা:

এক সময় যে ইসলাম ছিলো পুরো মুসলিম উম্মাহর মূল চালিকাশক্তি। যে ইসলামকে আঁকড়ে ধরে আমাদের পূর্বপুরুষগণ বদলে দিয়েছিলেন জাহেলী সকল সমাজ ব্যবস্থার চিত্র এবং সক্ষম হয়েছিলেন সারাবিশ্বে ইসলামের অগ্রযাত্রা ও বিপ্লবী চেতনা স্থাপন করতে। সেই ইসলামকে আজ গ্রাস করছে পাশ্চাত্যের গেলানো পুঁজিবাদ,সাম্রাজ্যবাদ, সেকুলারিজম,লিবারেলিজম, ভোগবাদ,ফেমিনিজম নামক বিষাক্ত কিছু চিন্তাধারা। এর একটি মূল কারণ হলো আজ মুসলিমরা ধীরে ধীরে ইসলামি শিক্ষার অনুসরণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ইসলাম যে উদারতা শিখায় এবং আমাদের পূর্বপুরুষগন যে কোরবানির মানসিকতা লালন করতেন, সে শিক্ষা থেকে মুসলিম উম্মাহ আজ বহুদূরে। আজ অধিকাংশ মুসলিমরা বেছে নিয়েছে আয়েশী জীবন এবং রাজনৈতিক,সামাজিক, প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ নানাদিক থেকে ঝুকে পড়েছে পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের জীবনের যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারিত করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, তা থেকে তারা আজ উদাসীন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর দেখানো পথ, আমাদের পূর্বপুরুষগণের স্বর্ণালী সেই যুগ, ইসলামে তাঁদের অবদান আজ মুসলিমরা ভুলতে বসেছে। ইসলামের আকর্ষণীয় ও বর্ণনাতীত বাস্তবসম্মত জীবনাচার বর্জন করে ,এর সম্পূর্ণ বিপরীত এক সমাজ ব্যবস্থা ও জীবনবোধের পদাঙ্ক অনুসরণ করছে।মুসলিমরা আজ নিজস্ব স্বকীয়তা ও সক্রিয়তা হারিয়ে পশ্চিমা সভ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে, তাদের বিভিন্ন চিন্তা চেতনা ধারণ করতে শুরু করেছে ।

স্বভাবতই রাজনৈতিক অর্থনৈতিকভাবে বেশি শক্তিশালী রাষ্ট্র সভ্যতা সমূহ তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সামাজিক বিভিন্ন চিন্তা চেতনা, কম সক্রিয় এবং দুর্বল রাষ্ট্রগুলোকে প্রভাবিত করে। আর যেহেতু মুসলিম বিশ্ব সময়ের পরিক্রমায় একে একে নিজেদের দুর্বলতার পরিচয় দিচ্ছে নিজেদের সক্রিয়তা হারাচ্ছে,তাই একইভাবে মুসলিম বিশ্বের উপর পশ্চিমা সভ্যতার নানা চিন্তাধারা ও সমাজব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করছে এবং আমাদের সাংস্কৃতিক কাঠামোতে পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। তবে এই পরিবর্তন আমাদের মুসলিম সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষে নাকি বিপক্ষে? এটা কি আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সালাম এর দেখানো পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে নাকি নিয়ে যাবে ধ্বংসের পথে? তা আজ মুসলিম সমাজের কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত। তাই এই বিষয়ে অধিক আলোচনা,গবেষণা ও তার প্রচার-প্রসার সচেতন মুসলিম উম্মাহর জন্য জরুরী হয়ে পরেছে।

যেন আজকের মুসলিমরা নিজেদের সোনালী অতীত জানার মাধ্যমে নিজেদের চিনতে পারে এবং খুঁজে বের করতে পারে যে তাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার মূল চালিকাশক্তি কী। এরই মাধ্যমে পুনরায় মুসলিম উম্মাহর দেহে বইবে প্রাণসঞ্চারী রক্তরস। পুনরায় তাদের মাঝে এই বিশ্বাস সঞ্চারিত হবে যে ইসলাম কেবল অন্যান্য ধর্ম গুলোর মত আত্মশুদ্ধি ও আচার অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইসলাম হলো এমন এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা,যা ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন ও রাষ্ট্রজীবনে ইনসাফ, শান্তি ও মানবিকতার ভিত্তি গড়ে তোলার এক সুবিন্যস্ত সভ্যতা।

মুসলিম পরিবারব্যবস্থা

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার বলতে বোঝায় মা বাবা, দাদা দাদী, নানা নানী, ছেলে মেয়ে ও নাতি-নাতনিদের নিয়ে গঠিত জনসমষ্টিকে। আল্লাহ তাআলা এই পারিবারিক জীবনকে সুশৃংখল,প্রশান্তির জায়গা এবং ইসলামের আলো ছড়ানোর প্রথম স্তর হিসেবে গড়ে তুলতে নানা ধরনের বিধি নিষেধ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। ইসলাম পারিবারিক জীবনকে কেন এত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে তা শুধুমাত্র তখনই অনুধাবন করা যাবে,যখন পরিবারের সকল সদস্যগণ সেই সকল বিধি নিষেধ দায়িত্ব ও ইনসাফের সাথে পালন করতে পারবে। নিম্নে পারিবারিক জীবনের প্রতি ইসলামের গুরুত্বারোপের উল্লেখযোগ্য কিছু দিক আলোচনা করা হলো:

■ বিবাহ: মুসলিম পরিবারের ভিত্তি:

ইসলামের দৃষ্টিতে বিবাহ শুধু নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তি নয় বরং বিবাহকে ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছেন এবং সওয়াব অর্জনের মাধ্যম করে দিয়েছেন। ইসলামে স্বামী স্ত্রী একে অপরের হক আদায়, আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে একটি বিবাহিত সম্পর্ক পরিপূর্ণতা লাভ করে। আর পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি হল বিবাহ।

আল্লাহ তায়ালা ইসলামী শরীয়তে বিবাহকে খুবই সহজ করে দিয়েছেন। দুজন নর-নারী পরস্পরে ইজাব কবুল করা এবং একই মজলিসে দুজন পুরুষ সাক্ষী বা একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোক সাক্ষীর মাধ্যমে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে থাকে।

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টিগতভাবেই নারীর প্রতি পুরুষের মনে এবং পুরুষের প্রতি নারী মনে আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এই সহজাত প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের একমাত্র কার্যকর ব্যবস্থা হল বিয়ে। তাই ইসলাম পরিবার গঠনে উদ্ধৃত করার জন্য বিয়ে নির্দেশ প্রদান করেছে।

আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা বলেন:

ۚ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۙ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۧ

অর্থ: “আর সতী সাধ্বী মুসলিম নারীরাও এবং তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাবের মধ্যকার সতী-সাধ্বী নারীরাও (তোমাদের জন্য হালাল), যখন তোমরা তাদেরকে তাদের বিনিময় (মোহর) প্রদান কর, এ রূপে যে, তোমরা (তাদেরকে) পত্নী রূপে গ্রহণ করে নাও, না প্রকাশ্যে ব্যভিচার কর, আর না গোপন প্রণয় কর; আর যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে কুফরী মিশ্রিত করবে তার ‘আমল নিস্ফল হয়ে যাবে এবং সে আখিরাতে সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।”(আল-মা’ইদাহ ৫:৫)

বিয়ে এমন এক কার্যকর ব্যবস্থা যা ব্যক্তির দেহ ও মনের চাহিদা পূরণ করে তাকে আত্মিক প্রশান্তি দান করে এবং ব্যভিচারের পর থেকে বিবৃত করে। তাই ইসলামে বৈরাগ্যবাদের কোন স্থান নেই। প্রচলিত নানা সংস্কৃতি অনুযায়ী স্ত্রী সন্তান ত্যাগ করার যে এক জীবন ব্যবস্থা, তা ইসলাম সম্মত নয়।

রাসুল সাঃ বলেছেন:
"এ যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে সে যেন বিয়ে করে ।কারণ তার দৃষ্টিকে সংবরণকারী এবং লজ্জাস্থানকে সংরক্ষণকারী। আর যে সক্ষম নয় তার সিয়াম পালন করা উচিত ।কারণ তা তার জন্য স্পৃহা দমনকারী।”(বুখারী)
তিনি আরো বলেন, “বিয়ে করা আমার সুন্নাত ,সুতরাং যে আমার সুন্নত বর্জন করবে সে আমার দলভুক্ত নয়।”(সুনান ইবনে মাজাহ)

বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সন্তান জন্মদান,বংশবিস্তার এবং ও মুসলিম উম্মাহর শক্তিশালী ভিত্তি গড়ে তোলা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “তোমরা এমন স্ত্রী লোকদের বিয়ে করবে ,যারা স্বামীদের অধিক ভালোবাসে এবং অধিক সন্তান প্রসব করে । কেননা আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে (পূর্ববর্তী উম্মতদের ওপর) গর্ব প্রকাশ করব।” (সুনান আবু দাউদ)

এছাড়াও বিবাহের মাধ্যমে চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে জাতি রক্ষা পায়, সমাজে যেনা ব্যভিচার অশ্লীলতা হ্রাস পায়। আদর্শ জাতি ও আদর্শ সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। বিবাহের ফলে মানুষের মাঝে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অনুভূতি জাগ্রত ও সে অনুযায়ী যোগ্যতা অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করে। এছাড়া আল্লাহ সাহায্য লাভ ও আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পায়।এ সকল উদ্দেশ্য উপলব্ধির মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি ইসলাম কেন বিবাহের এই বন্ধনকে এত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে।তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিবাহের এ বন্ধনকে জুড়ে কোরআন ও হাদিসে নানা রকমের বিধি নিষেধ নাযিল করেছেন। যেগুলো অনুসরণের ফলে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন হয়ে ওঠে প্রশান্তিদায়ক ও আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম।

■ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক ও হক্কসমূহ:

একটি পরিবার তখনই সুশৃংখল ও গতিশীল ভাবে অগ্রসর হয়, যখন ওই পরিবারের প্রত্যেক সদস্য তাদের পরস্পর সম্পর্কের প্রতি ন্যয়বান ও যত্নশীল হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সম্পর্কটি হলো স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক। এই সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর জন্য তখনই স্বস্তি ও প্রশান্তির জায়গায় রূপ নেয়, যখন তাতে ইহসান ও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করা হয়।

স্বাভাবিকভাবেই কোন সমষ্টিগত কাজে সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখতে একজনকে নেতা বানিয়ে নেয়া হয়। যেন সুষ্ঠুভাবে সে কাজের উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয়। ইসলাম ও এর ব্যতিক্রম নয়। শারীরিক শক্তি ও অন্যান্য গুণাবলীর জন্য সৃষ্টিগতভাবে পুরুষ তুলনামূলকভাবে বেশি সক্ষম বলে,স্বামী স্ত্রীর এই সম্পর্কের ক্ষেত্রেও স্বামীকে তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছে। তার মানে এই নয় যে পুরুষর সর্বদা নারীর উপর প্রভাব খাটাবে এবং নারীরা কোনঠাসা হয়ে থাকবে। বরং তা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বরকত ও রহমতের কারণ।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,
“পুরুষ নারীর কর্তা, কেননা আল্লাহ তাদের একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এ জন্য যে পুরুষরা তাদের নিজেদের ধনসম্পদ থেকে ব্যয় করে”(সূরা নিসা-৩৪)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন,

"এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও দয়া সঞ্চার করেছেন"(রূম-২১)

ইসলামী শরীয়ত নারীদের জন্য পুরুষের কর্তৃত্ব স্থাপন করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং পুরুষরা যেন এই দায়িত্ব ইনসাফ ও তাকওয়ার সাথে পূরণ করে সেই নির্দেশনাও দিয়েছে। নির্দেশনা মোতাবেক দায়িত্ব পূরণ না করতে পারলে আল্লাহ তায়ালার নিকটের জবাবদিহিতা রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন করবে।" (সূরা নিসা-১৯)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَٰتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا۟ عَلَيْهِنَّ ح يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا۟ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُۥٓ أُخْرَىٰ﴿٦﴾ ۚ

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا﴿٧﴾

"অর্থ:তোমরা তাদের তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী নিজ গৃহে বাস করতে দেবে এবং তাদেরকে কষ্ট দিও না, যাতে তোমরা তাদের সংকটে ফেলো। তারা যদি গর্ভবতী হয় তবে সন্তান জন্ম দেওয়া পর্যন্ত তাদের ব্যয়ভার বহন করবে...

যার সামর্থ্য আছে, সে তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে; আর যার রিজিক সংকুচিত, সে আল্লাহ যে পরিমাণ দিয়েছে তা থেকেই ব্যয় করবে। আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ কষ্টের পর স্বাচ্ছন্দ্য দান করবেন।"(সূরা আত্-তালাক, আয়াত ৬–৭)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট সর্বোত্তম।"(জামে আত তিরমিজি)

একটি সম্পর্ক সুন্দর ও সুশৃংখল করতে প্রত্যেকের ভূমিকা রাখতে হয়। ঠিক তেমনি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক তখনই রহমতও বরকতে ভরপুর হবে যখন স্বামী-স্ত্রী উভয় তাদের ভূমিকা যথাযথভাবে

পালন করবে। এ সম্পর্কে স্বামীর যেমন অনেক দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে, তেমনই স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও আল্লাহ তায়ালা দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছেন।

নবী (ﷺ) বলেন,
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ.

"রমণী তার পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়লে, রমযানের রোযা পালন করলে, ইজ্জতের হিফাযত করলে ও স্বামীর তাবেদারী করলে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়ে ইচ্ছামত প্রবেশ করতে পারবে।"(ত্বাবারানী, ইবনে হিববান, সহীহ, মুসনাদে আহমদ)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম আরো বলেছেন:
ثَلاَثَةٌ لاَ يُقبَلُ منهُم صَلاَةٌ وَلاَ تَصعُدُ إِلَى السَّمَاءِ وَلاَ تَجَاوزُ رُءُوسُهُم : رَجُلٌ أَمَّ قَوماً وَهُم لَه كَارِهُونَ ، وَرَجُلٌ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يُؤمَر ، وَامرَأَةٌ دَعَاهَا زَوجُهَا من اللَّيلِ فَأَبَتْ عَلَيه.

"তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় না, আকাশের দিকে উঠে না; মাথার উপরে যায় না; এমন ইমাম যার ইমামতি (অধিকাংশ) লোকে অপছন্দ করে, বিনা আদেশে যে কারো জানাযা পড়ায় এবং রাত্রে সঙ্গমের উদ্দেশ্যে স্বামী ডাকলে যে স্ত্রী তাতে অসম্মত হয়।"(আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ ৬৫০নং)

স্বামীর মান-মর্যাদা ও চাহিদার প্রতি খেয়াল রাখা স্ত্রীর দায়িত্ব। স্বামীর আনুগত্য স্ত্রীর জন্য আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য। স্বামীকে সন্তুষ্ট করলে আল্লাহ তায়ালাও সন্তুষ্ট হন। তবে এই আনুগত্যের ক্ষেত্রেও শরিয়া পরিপন্থী কোন আদেশ মেনে নেওয়া নিষিদ্ধ। এভাবে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের হক যথাযথ আদায়ের মাধ্যমে আদর্শবান দাম্পত্য জীবন গঠন সম্ভব, যার মাধ্যমে গড়ে উঠবে প্রকৃত ইসলামসম্মত আদর্শ পরিবার ও সভ্যতা।

■ পিতা-মাতার হক্ক ও কর্তব্য:

দুনিয়াতে সকল সম্পর্ক এবং ভালোবাসার ভেতর স্বার্থ নিহিত থাকে। স্বার্থের জন্যই একে অপরকে ভালোবাসে। তবে একটি সম্পর্ক এর ব্যতিক্রম, আর তা হল পিতা মাতার ভালোবাসা। সকল স্বার্থের উর্ধ্বে পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের ভালোবাসেন। জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নিজেদের প্রাণের বিনিময়েও সন্তানের কোন ধরনের ক্ষতি যেন না হয় সে ক্ষেত্রে সর্বদা সতর্ক থাকেন। আর এই কারণেই সকল হক সমূহের উপর ইসলাম পিতা-মাতার হকের স্থান দিয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থ: "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করো এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো।

তাদের কেউ বা উভয়েই যদি বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের প্রতি 'উফ' পর্যন্ত বলবে না, তাদের ধমক দিও না; বরং সম্মানজনক কথা বলবে।

আর দয়া করে বিনয়ের ডানা নামিয়ে বলো — "হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছিলেন।"-সূরা আল-ইসরা (১৭:২৩-২৪)

এক সাহাবি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন:

"হে আল্লাহর রাসূল, মানুষের মধ্যে কার সঙ্গে আমি উত্তম আচরণ করব?"

নবী ﷺ বললেন: "তোমার মা।"

তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন: "এরপর কে?"

নবী ﷺ বললেন: "তোমার মা।"

আবার জিজ্ঞেস করলেন: "এরপর কে?"

নবী ﷺ বললেন: "তোমার মা।"

তিনি চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলে নবী ﷺ বললেন: "তারপর তোমার পিতা।"-(সহিহ বুখারী, সহিহ মুসলিম)

এমনকি ইসলামে পিতা-মাতার হককে আল্লাহর পথে জিহাদ অপেক্ষা ও বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছে।

হাদিস শরীফে আছে, জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসুল আল্লাহ! আমার জিহাদে যাওয়ার বড় সাধ। ইহার দ্বারা আমার একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টি অর্জন এবং তার কাছে সব পূর্ণ লাভ। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, “বাস্তবে কি তুমি সব লাভের আশায় জিহাদে যেতে চাচ্ছ?সাহাবী বললেন, “হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কেবল সওয়াবই অর্জন করতে চাই।” তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার পিতা-মাতাকে জীবিত?” সাহাবী বললেন, “হে আমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন।” তিনি বললেন, “তবে তুমি তাদের কাছে চলে যাও এবং তাদের খেদমত করতে থাকো, কেননা সাওয়াব পাওয়াই যদি তোমার উদ্দেশ্যে হয় তবে তাদের খেদমত করে তুমি যে সওয়াব পাবে জিহাদে গিয়েও তা অর্জন হবে না।”(বুখারী,মুসলিম)

পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার আয়ু ও রিজিক বৃদ্ধির কারণ।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
“যে ব্যক্তি তার আয়ু রিজিক বৃদ্ধি করতে ইচ্ছুক, সে যেন তার মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে।”-(সহিহ আত তারগিব)

পিতা মাতার সাথে সম্পর্কছেদ করা কবিরা গুনাহে শামিল।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহ সম্পর্কে অবগত করবো না?” সাহাবীগণ বলেন, “হে অবশ্যই ইয়া রাসুল আল্লাহ!” তিনি বলেন: “আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।”

সন্তানের সম্পদে পিতা-মাতার হক রয়েছে। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত পিতা-মাতার জন্য অর্থ ব্যয় করা সচ্ছল সন্তানের উপর ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আলিমগণের ইজমা রয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ؕ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰي وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

অর্থ: "তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, তারা কিরূপে ব্যয় করবে? তুমি বলঃ তোমরা ধন সম্পত্তি হতে যা ব্যয় করবে তা মাতা-পিতার, আত্মীয়-স্বজনের, পিতৃহীনদের, দরিদ্রদের ও পথিকবৃন্দের জন্য কর; এবং তোমরা যে সব সৎকাজ কর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা সম্যক রূপে অবগত।"-আল-বাকারাহ ২:২১৫

■ সন্তান প্রতিপালনে ইসলামী তরবিয়ত:

সন্তান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক বিশেষ নেয়ামত। সন্তান পিতা-মাতার জন্য যেমন প্রশান্তির কারণ,ঠিক তেমনি পিতা-মাতার সাদকায়ে জারিয়ার উৎস। সন্তান যদি সৎ ও ঈমানের উপর থাকে, পিতা মাতা মৃত্যুর পরও সে সকল কাজের বিনিময়ে পাবে। আর যদি সন্তান বদকার হয় তার বিনিময়ও পিতা-মাতা পাবে। তাই ইসলাম শিশুদের ছোটবেলা থেকেই দ্বীনি শিক্ষা ও ইসলামী তরবিয়তের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

প্রতিটি শিশুই ইসলামী ফিতরাতের উপর জন্ম নেয়। মুসলিম পিতা-মাতার কর্তব্য সে অনুযায়ী সন্তানদের লালন পালন করে তাদের ফিতরাতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা। তা না হলে এই সন্তানে একদিন হয়ে উঠবে জাহান্নামের কারণ,

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "প্রতিটি নবজাতকই জন্ম লাভ করে (ইসলামী) ফিতরাতের উপর। এরপর তার মা বাপ তাকে ইহুদি বা খ্রিস্টান বা অগ্নি পূজারী রূপে গড়ে তোলে।"-(বুখারী)

পিতা-মাতার সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই যদি আল্লাহর ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাদের সম্পর্ক মজবুতভাবে গড়ে তোলে, তাহলে তারাই একসময় আল্লাহর জন্য কোন ত্যাগ করতে দ্বিধা করবে না। তারাই আগামী দিনে শ্রেষ্ঠ মুমিন ও মুজাহিদ হয়ে গড়ে উঠবে, ইসলামের বিজয় নিয়ে আসবে। তাই মুসলিম পিতা-মাতার কর্তব্য তাদের ছোটবেলা

থেকে ঈমান,ইসলাম ও দ্বীন শিক্ষা, সুন্নত,সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ, নামাজ শিক্ষা, শিষ্টাচার শেখানো এবং শিরক মুক্ত রেখে বড় করে তোলা। তাদের আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পরিবারেও সেরকম পরিবেশ গড়ে তোলা।

ইসলাম কন্যা সন্তান পুত্র সন্তান উভয়ের মাঝে সমতার নির্দেশনাও দিয়েছে । জাহেলী যুগে জীবন্ত কন্যা শিশুকে পুঁতে ফেলা হতো। একমাত্র ইসলামই এই প্রথা বাতিল করেছে এবং নারীদের অধিক মর্যাদা দান করেছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:
“যে ব্যক্তি বয়প্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত দুটি কন্যার লালন পালনের দায়িত্ব পালন করবে, আমিও সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন এভাবে থাকবো। এ কথা বলে তিনি নিজের আঙ্গুলগুলো মিলালেন।”

সুতরাং পিতা-মাতার উচিত কন্যা ও পুত্র সন্তান উভয়ের মাঝে সমতা রেখে তাদের দ্বীনি ও আদর্শ শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলা।

■ ইসলামী পরিবারে নারীর ভূমিকা ও মর্যাদা:

ইসলামপূর্ব যুগে নারীদের যথাযথ কোন মর্যাদা দেয়া হতো না। নারীদের মানবিক অধিকার সমূহের উপযুক্তই মনে করা হতো না। শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজনে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হতো। বর্তমান যুগেও নারীদের সাথে এমনই হয়ে আসছে, তবে ভিন্ন আঙ্গিকে। একমাত্র ইসলামই সর্বক্ষেত্রে নারীদের যথাযথ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ইসলাম নারীকে সমাজে মর্যাদা ও নিরাপত্তাতো দিয়েছেই সাথে দিয়েছে সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষা ও জ্ঞানের অধিকার, মতামতের অগ্রাধিকার,মাতৃত্ব কন্যা হিসেবে মর্যাদা এসো আরো নানাবিধ অধিকার। এমনকি নারী-পুরুষের উভয়ের সমান মর্যাদা সমান করা হয়েছে, বরং কিছু ক্ষেত্রে নারীদের তুলনামূলক বেশি অধিকার দেয়া হয়েছে। যা অন্য কোন ধর্ম বা সভ্যতায় কখনো

পরিলক্ষিত হয়নি। ইসলামী শরীয়তে নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন বিধান ও নির্দেশনা আরোপ করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:
"নারীদের জন্যও তাদের প্রাপ্য অধিকার রয়েছে যেমন পুরুষদের জন্য রয়েছে তাদের অধিকার, ন্যায়সঙ্গতভাবে।"
— সূরা আল-বাকারা (২:২২৮)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ করে।"
— (সুনান তিরমিযী ৩৮৯৫)

এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল ﷺ, আমার উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে?"
নবী ﷺ বললেন, "তোমার মা।"
তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কে?"
নবী ﷺ বললেন, "তোমার মা।"
আবার জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর কে?"
নবী ﷺ বললেন, "তোমার মা।"
এরপর বললেন, "তোমার বাবা।"— (সহীহ বুখারী ৫৯৭১, সহীহ মুসলিম ২৫৪৮)

কন্যা হিসেবে ও নারীদের ইসলাম যথাযথ মর্যাদা প্রদান করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি দুই কন্যাকে লালন-পালন করবে যতক্ষণ না তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়, সে কিয়ামতের দিনে আমার সঙ্গে থাকবে (এবং নবী ﷺ দুটি আঙুল পাশাপাশি করে দেখালেন)।"— (সহীহ মুসলিম ২৬৩১)

একটি আদর্শ পরিবার গঠনে একজন পুরুষের যেমন নানাবিধ দায়িত্ব রয়েছে, ঠিক তেমনই একজন নারীর দায়িত্ব পালনের ভূমিকা অপরিসীম। একটি পরিবারে নারীর কন্যা, স্ত্রী, মা এভাবে পর্যায়ক্রমে দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে হয়। একটি পরিবার তখনই আদর্শবান ও চক্ষুশীতলকারী হয়ে ওঠে, যখন সেই পরিবারের নারীরা তাকওয়া, ধৈর্যশীলতা ও সহযোগিতা-সহমর্মিতার সাথে নিজ দায়িত্বগুলো পূরণ করে। এছাড়াও সন্তানের তরবিয়তে পিতার তুলনায় মায়ের ভূমিকাই অধিক থাকে। একজন আদর্শবান মা-ই পারে আদর্শবান ও পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত সন্তান গড়ে তুলতে। আর সুগঠিত পরিবার ও সৎ-চরিত্রবান মানুষের দ্বারাই গঠিত হতে পারে সুশৃংখল- গতিশীল সমাজ ব্যবস্থা ও সভ্যতা। সুতরাং সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত সমাজ ও সভ্যতা গঠনে নারীর ভূমিকা অপরিসীম।

■ মুসলিম পরিবারে ইসলামী নীতিমালা ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ-সমাজে তার প্রভাব:

ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সুষমতা, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার শিক্ষা দেয়। পরিবার হলো প্রতিটি ব্যক্তির জন্য এই শিক্ষা অর্জনের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান। পরিবারের মাধ্যমে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক গুন, নৈতিকতা ও আল্লাহভীতিসম্পন্ন চরিত্র অর্জনে সক্ষম হয়। এর প্রভাব শুধু পরিবারেই নয়, বরং সমাজ,জাতি ও সভ্যতার মাঝে ছড়িয়ে পড়ে।ইসলামই একমাত্র ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠনে সক্ষম। ইসলামী নৈতিকতায় প্রতিষ্ঠিত পরিবার ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় বিরাজ করে প্রকৃত সুখ-শান্তি,শৃঙ্খলা, দয়া, সহমর্মিতা ও পরস্পর সহযোগিতা। এখানে সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়, কেউ কারো হক নষ্ট করার সম্ভাবনা থাকে না। পরস্পরের মাঝে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্টির জন্য ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় ধনী-গরিব, নারী-পুরুষের সকল বৈষম্য দূর হয়।যাকাত ও সাদকাহ এর ফলে ধনী গরিবের মাঝে দয়া ও সহমর্মিতা তৈরি হয় এবং অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় থাকে। যা মূলত ভোগবাদী সমাজ ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। ইসলাম কোন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বৈষম্য তৈরি করে না, বরং সকল বিধান সুষমতা ও ইনসাফের সাথে আরোপ করেছে।এক্ষেত্রে নারী পুরুষ কারো সাথে কোন প্রকার জুলুম করা হয় না এবং উভয়কে সমান মর্যাদা দেয়া হয়েছে, বরং কিছুক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা তুলনামূলক অধিক।

ইসলামে প্রতিবেশী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ও হকের প্রতি এতো বেশি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে যে, এমন নজির আর কোন ধর্ম কিংবা সভ্যতায় দেখা যায় না। ফলে সমাজে এক অতুলনীয় সহমর্মিতা ও সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হয়, সমাজে সবার মাঝে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّه

অর্থ: আত্মীয়কে তার হক দাও।-সূরা ইসরা ১৭:২৬

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
"আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"-(সহিহ বুখারি: 5984)
প্রতিবেশীর হক এত বেশি বলা হয়েছে যে,নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশঙ্কা করেছেন, প্রতিবেশীকে ওয়ারিশ না বানিয়ে দেওয়া হয়।-(সহিহ বুখারী: ৬০১৪)

ইসলামের আদর্শে গঠিত পরিবারের মাঝে বেড়ে ওঠা প্রজন্ম শিখতে পারে আল্লাহ ভীতি,সততা,নীতি-নৈতিকতা, সহমর্মিতা, বিনয় ও দয়া। ফলে পরিবার ও সমাজ জীবন থেকে অন্যায় অবিচার, দুর্নীতি,প্রতারণা,হিংসা বিদ্বেষ দূরীভূত হয়। নামাজ, কোরআন তেলাওয়াত, দোয়া ইত্যাদি শেখার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবন থেকে দুশ্চিন্তা,হতাশা দূরীভূত হয়, বিরাজ করে প্রশান্তি ও আল্লাহর রহমত। ইসলাম শিক্ষা দেয় লজ্জাশীলতার এবং পর্দা ইসলামের একটি ফরজ বিধান, এর ফলে সমাজ থেকে দূর হয় অশ্লীলতা ও চরিত্রহীনতা।

পশ্চিমা পরিবারব্যবস্থা

■ পশ্চিমা পরিবারব্যবস্থার ঐতিহাসিক পটভূমি:

খ্রিস্টবাদের সাথে ইউরোপের হাজার বছরের সম্পর্ক। দীর্ঘসময় ইউরোপে খৃষ্টবাদের এরই আধিপত্য ছিল।তবে পরবর্তীতে ধর্মের ব্যাপারে ইউরোপের অভিজ্ঞতাটা হয়ে ওঠে ভয়াবহ। ইউরোপে যে খ্রিস্টধর্মের আধিপত্য ছিল সেটি মূলত ঈসা আলাইহিস সালামের উপর নাযিলকৃত ধর্মের অনুসারী ছিল না, বরং তা ছিল মানবসৃষ্ট খ্রিস্টধর্মের যাজকদের অনৈতিকতা, শতাব্দীর পর শতাব্দী ডাইনি নিধন, বুবোনিক প্লেগ, চার্চ সমর্থিত সমাজতন্ত্রের অত্যাচার- সবমিলিয়ে ধর্ম ইউরোপের কাছে শত্রু হিসেবে পরিচয় লাভ করে। মানবসৃষ্ট এই ধর্মের যাঁতাকলে পিষ্ট ইউরোপ সভ্যতা, মুক্তির তালাশ শুরু করে।

অবশেষে রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতি সর্বক্ষেত্র থেকে ধর্মকে ঝাঁটাই করে দেয়। শুরু হয় ব্যক্তি স্বাধীনতা, অর্থাৎ কেউ কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নয়,ব্যক্তি নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে-নিজের ইচ্ছামতো নিজ খায়েশ পূরণ করবে। যুক্তি আর ইন্দ্রিয়ই সব,যুক্তি-ইন্দ্রিয়র বিপরীতে গেলে, কোনো অলৌকিকত্ব,ওহি ও ধ্যান ধারণা মেনে নেওয়া হবে না। পার্থিব কল্যাণ ও সুখই হয়ে ওঠে জীবনের মূল উদ্দেশ্য।

পাশ্চাত্য সভ্যতা বর্তমানে গ্রীক দর্শনের অনেক মূলনীতি অনুসরণ করে চলে। আর এই গ্রীক দর্শনের প্রধান মনোযোগ ছিল বস্তুজগত অর্থাৎ তাদের চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরকালের কোন অস্তিত্ব ছিল না।এই ভ্রান্ত গ্রিক সভ্যতার আধুনিক রুপই হল বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা। পশ্চিমা পরিবারগুলো ধর্মনিরপেক্ষতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, পুঁজিবাদ, ভোগবাদ ইত্যাদি মানদন্ড ও দর্শনের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়।

■ বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্কের ধারণা পশ্চিমা সমাজে:

পশ্চিমে পরিবারগুলো পূর্বে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে গঠিত ছিল, তবে বর্তমানে তা ব্যক্তি স্বাধীনতা,ব্যক্তি সুখ ও আত্ম-পরিপূর্ণতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ক্যারিয়ারের প্রতি অগ্রাধিকার বেশি থাকায়,তারা বিবাহের মতো কোন প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হতে আগ্রহী হয় না। বিবাহের পরিবর্তে তারা লিভ টুগেদারের সম্পর্ককে বেছে নেয়। কেননা এর ফলে আইনত জটিলতা ছাড়াই বিচ্ছেদের সুযোগ রয়েছে।তাদের মাঝে সম্পর্কের স্থায়িত্বের কোন অগ্রাধিকার থাকে না। কখনো কখনো একাধিক সঙ্গীর সাথে সম্পর্ক থাকে।তাদের মাঝে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক আইনত বৈধ। তারা নারী-নারী কিংবা পুরুষ-পুরুষ অর্থাৎ সমকামী দাম্পত্য জীবন বেছে নেয়, সমকামিতাও সেখানে আইনত বৈধ। যেহেতু তাদের মাঝে বিচ্ছেদ প্রক্রিয়া অতি সহজ, এ সকল বিচ্ছেদের ফলে সিঙ্গেল প্যারেন্টিং ফ্যামিলির সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

■ সন্তান প্রতিপালন ও পারিবারিক দায়িত্ববোধের পরিবর্তন:

পশ্চিমা সংস্কৃতিতে পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন-আধুনিকতা নারীবাদ ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা গুলো দ্বারা প্রভাবিত। পশ্চিমা দেশগুলোতে জন্মহার ব্যাপক হারে হ্রাস পাচ্ছে। এর একটি মূল কারণ, বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক। সাধারণত বিবাহবহির্ভূত সম্পর্ক গুলোতে সন্তান জন্মদানের প্রবণতা কম থাকে। এখানে মূলত ভোগই প্রাধান্য পেয়ে থাকে, সন্তান প্রতিপালনের কোন চাহিদা থাকে না। এছাড়াও নারীবাদী মনোভাবের ফলে নারীরা পরিবার ও সন্তান প্রতিপালন থেকে ক্যারিয়ারকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে এবং 'শরীরের উপর অধিকার' এমন মনোভাব লালন করে।ফলে তাদের মাঝে সন্তান জন্মদানের প্রবণতা থাকে না এবং গর্ভপাতের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর সন্তান থাকলেও, সে সকল পিতা-মাতা সন্তান প্রতিপালনের চেয়ে ব্যক্তিগত জীবনকে বেশি অগ্রাধিকার দেয়,অনেকের কাছে সন্তান প্রতিপালন অতিরিক্ত বোঝাস্বরূপ।ফলে সে সকল শিশুরা প্রতিপালিত হয় বিভিন্ন ডে কেয়ার সেন্টারে, বেবিসিটার ও ন্যানিদের (পেশাদার সন্তান লালনকারী)কাছে।

পশ্চিমা পরিবার গুলোতে দেখা যায় সন্তানরা অল্প বয়সেই বাড়ি ছেড়ে দেয়, কেননা তারা মা বাবার অধীনস্থ না থেকে, স্বাধীনভাবে থাকতে চায়। মা-বাবার অধীনস্থ হয়ে থাকাকে তারা পরাধীনতা ভাবে।

■ পশ্চিমা পরিবারে ধর্মীয় মূল্যবোধের অবস্থান:

পশ্চিমাদের মতে ব্যক্তিগত জীবন কেবলই ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট, তাতে ধর্মের কোন বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তি নিজস্ব জীবন ব্যবস্থায় ধর্ম মেনেও নেয়, কিন্তু নিজস্ব সত্তা পেরিয়ে সন্তান, স্ত্রী,মা বাবা,ভাই বোনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায় তখন তা আর ব্যক্তিগত জীবন থাকে না, হয়ে যায় সমষ্টিগত জীবন। আর এই সমষ্টিগত জীবনে ধর্মের আর কোন প্রভাব থাকতে পারে না মেনে চলতে হয় হিউম্যান রাইটস।
তাদের সমস্ত ভালো মন্দের মাপকাঠি যুক্তি ও বিজ্ঞান। অর্থাৎ আকল কিংবা বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে যে সকল বিষয় ধর্মের সাথে সাংঘর্ষিক, সেসকল বিষয় অস্বীকার করতে হবে, ধর্মের সেই মতকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

পাশ্চাত্যের কাছে সমস্ত ভালো মন্দের মাপকাঠি আকল বা যুক্তি। যুক্তি ও সমাজকে তারা খোদার আসনে বসিয়েছে। তারা ধর্মকে ততটুকুই গ্রহণ করে যতটুকু সমাজ ও তাদের যুক্তির সাথে খাপ খায়, এছাড়া বাকি সব তারা প্রত্যাখ্যান করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে থাকে। তারা আল্লাহর স্থানে মানুষকে আর নবী রাসূলের শিক্ষার স্থানে আকল কে বসিয়েছে। মোটকথা তারা খায়েশের গোলাম তথা নফস পূজারী, অথচ তারা খায়েশ পূরণ করার নেশায় নিজেদের সর্বস্বাধীন বলে দাবি করে।

ধর্মীয় অনুশাসন ও বাধ্যবাধকতা হ্রাস পাওয়াই পাশ্চাত্যের কাছে উন্নতি। তারা ধর্মকে সাম্প্রদায়িক হিসেবে দেখিয়ে ব্যক্তি জীবন থেকে দ্বীনকে সরিয়ে দিতে চায়।অথচ তাদের এই সাম্প্রদায়িকতা কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে না। কেননা তারা তাদের নিজস্ব কল্যাণের ধারণার সাথে সাংঘর্ষিক কোন দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নেয় না। যেমন বাল্যপ্রেম ও ব্যভিচার তাদের কাছে অনুমোদন পায়, অথচ উভয় পক্ষের সম্মতি থাকা সত্ত্বেও বাল্যবিবাহ তাদের কাছে দণ্ডনীয় অপরাধ।

সুতরাং বলাই বাহুল্য, তাদের সভ্যতাতেই যেহেতু ধর্মের কোন অস্তিত্ব নেই, ব্যক্তিস্বাধীনতা আর ভোগবাদিতাই মূল,সেহেতু এ সকল পরিবারেও ধর্মের কোন চর্চা নেই। কিছু কিছু পরিবারে খ্রিস্টধর্মের(ঈসা আঃ এর প্রচারিত খ্রিস্টধর্ম নয়, বরং মানবসৃষ্ট খ্রিস্টধর্ম) চর্চা থাকলেও, কোন

বাধ্যবাধকতা থাকেনা। মা-বাবাও সন্তানদের কোন ধর্মে পরিচালিত করার বা ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়ার অধিকার রাখে না। কেননা তাদের মতে,তা ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে।

ইসলামী ও পশ্চিমা পরিবারের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

■ বিবাহ ও সম্পর্কের দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা:

পশ্চিমা সভ্যতায় ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রভাবে তারা দুনিয়াবি উন্নতি,ক্যারিয়ার, ভোগ ইত্যাদিকেই অধিক প্রাধান্য দিয়ে থাকে, ফলে বিবাহের মতো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সম্পর্কে জড়াতে চায় না। অধিকাংশ পশ্চিমারা লিভ টুগেদার,ব্যভিচার, পরকীয়া, সমকামিতা, একাধিক সঙ্গী গ্রহণ এ সকল নন-কমিটমেন্ট সম্পর্কে জড়ায়।কেননা এই সকল সম্পর্ক থেকে বের হতে কোন আইনি জটিলতার মুখোমুখি হতে হয় না। আর এই সকল সম্পর্কের মুল উদ্দেশ্যই হল ভোগ, পরিবার গঠন নয়।

মানব সভ্যতা পৃথিবীতে টিকে থাকবে পুরুষ এবং নারীর স্বাভাবিক বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, এর বাইরে বৈবাহিক বহির্ভূত যত সম্পর্ক রয়েছে, সেগুলো প্রত্যেকটি ব্যর্থ হতে বাধ্য, বরং ইতিমধ্যে এর নজির পাওয়া যাচ্ছে।

» ১৯৭০ সালে আমেরিকায় লিভ-টুগেদার পরিবারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৫ লাখ, ২০০২ এসে সেটা হলো ৪৯ লাখ।-US Census Bureau. 2003. “Unmarried-Couple Households, by Presence of Children, 1960 to Present,” Table UC–1, June 12, 2003.
১ম বাচ্চা জন্মের পর এসব পরিবার টেকে ৩৫%, মানে ভেঙেই যায় ৬৫% (Donahue et al, 2010)।

» আমেরিকার ৫০% ১ম বিয়ে বিচ্ছেদে পর্যবসিত হয় (Bramlett & Mosher, 2001)। রিসার্চ জানাচ্ছে, মোট ডিভোর্সির ৪৮%-এরই বিবাহিত জীবনে ব্যভিচারের ইতিহাস আছে (Janus, 1993)।

>আমেরিকার প্রথম শিশুদের ৪৮% অবিবাহিত মায়ের সন্তান।-(Knot yet: the benefits and cost of delayed marriage in America, a new report from the national campaign...)

» আমেরিকায় মোট জন্মের ৪৮% শিশুই বিবাহ বহির্ভূত বাবা–মায়ের সন্তান।
২০১৬ সালে ইউরোপ–আমেরিকার অর্ধেক শিশু বিবাহ–ছাড়া (out-of-wedlock) জন্ম।-https://twitter.com/spectatorindex/status/988370897955233788
যে পরিবারের ৬৫%–ই ভেঙে যায়, ভাঙার জন্যই যার সৃষ্টি। যতদিন ভালো লাগবে একসাথে থাকবে, ভালো না লাগলে থাকবে না।

এজন্য ইসলামে কোন মুসলিমের বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া সবচেয়ে বড় অপরাধ ও গুনাহ। কেননা এটি মানব সভ্যতা ধ্বংস করার মত একটি পদক্ষেপ। ইসলাম বিবাহকে ইবাদতের ও সওয়াব হাসিলের মাধ্যম করে দিয়েছেন। ইসলামের দৃষ্টিতে এটি একটি পবিত্র বন্ধন। বিবাহের মাধ্যমে আদর্শ পরিবার ও আদর্শ জাতি গঠিত হয়,জাতি চারিত্রিক অবক্ষয় ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা পায় এবং মানুষের মাঝে দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের অনুভূতি জাগ্রত হয়। পৃথিবীতে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য তৈরি হয়।

ইসলামে স্বামী স্ত্রী একে অপরের হক আদায়, আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে একটি বিবাহিত সম্পর্ক পরিপূর্ণতা লাভ করে। ইসলাম নারী পুরুষের মাঝে দায়িত্ব সুষমতা ও ইনসাফভিত্তিকভাবে বন্টন করে দিয়েছেন, ফলে বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনে এক অতুলনীয় ভারসাম্যপূর্ণতা সৃষ্টি হয়। বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবন হয়ে ওঠে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য প্রশান্তি স্থল।

কিন্তু পশ্চিমা পরিবারগুলোতে এর ভিন্নতা দেখা দেয়। নারীবাদ ও পুঁজিবাদের আগ্রাসনে তাদের পরিবারগুলোতে কোন ভারসাম্য থাকে না। নারীদের মাঝে তাদের পরিবারে যে প্রধান ভূমিকা রয়েছে তা পালনে অনীহা থাকে। সন্তান প্রতিপালনে আগ্রহী থাকে না। স্বামী স্ত্রী একে অপরকে প্রতিযোগী হিসেবে বিবেচনা করে। ফলে ওই সকল পরিবার ব্যবস্থা দুর্বল ও ভঙ্গুর হয়। সন্তানেরা

মা-বাবার কোন্দল ও বিচ্ছেদ দেখে বড় হয়, হয়তো তারা বাবাকে পাচ্ছে নয়তো মাকে,তাদের নৈতিক অবক্ষয় ঘটে।পরিবার তাদের কাছে প্রশান্তির স্থল তো নয়ই, বরং এক সময় তারা মা-বাবার অধীনস্থে থাকাকে পরাধীনতা ভাবতে থাকে এবং আলাদা জীবন যাপন করে।

■ সন্তান প্রতিপালন ও নৈতিক শিক্ষার পার্থক্য:

পশ্চিমা দেশগুলোতে জন্মহার ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। প্রত্যেকটি উন্নত দেশ অত্যন্ত কঠিন ভাবে এই সমস্যার মুখোমুখি, তারা নানাভাবে প্রণোদনা দিয়েও জন্মহার স্বাভাবিক করতে পারছে না।এভাবে যদি আগামী ১০০ বছরও চলতে থাকে তাহলে একসময় মানব সভ্যতা হুমকির মুখে পড়বে। মানুষ যখন বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক করে তখন ভোগের বিষয়টিই মুখ্য হয়,সন্তান নেয়ার প্রবণতা থাকে না। কোন সমাজ বা সভ্যতায় যখন এই সকল সম্পর্কের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, তখন জন্মহার হ্রাস পেতে থাকে। যেমনটা পশ্চিমা উন্নত দেশগুলোর ক্ষেত্রে প্রমাণিত হচ্ছে-

» একটা দেশের জনসংখ্যা স্থির রাখতে প্রয়োজনীয় জন্মহার ২.১% অর্থাৎ প্রতি নারীকে তার জীবদ্দশায় ২.১ জন সন্তান জন্ম দিতে হবে, নয়তো সে দেশের জনসংখ্যা কমে যাবে। বর্তমানে উন্নত দেশের জন্মহার কমে যাচ্ছে দ্রুত। ইউরোপীয় ইউনিয়নের গড় ১.৬%। আমেরিকার ১.৭৭%। মূল কারণ হচ্ছে ৫০ বছরের নারীবাদী এজেন্ডা। অনেক উন্নত দেশকেই (South Korea, Singapore, France, Australia, Canada, Russia, Poland) বিবাহ ও সন্তান জন্মদানকে উৎসাহিত করতে হচ্ছে ট্যাক্স মাফ, বাড়িভাড়া প্রদান, গণপরিবহনে বিশেষ ছাড়, বেবি-বোনাস ইত্যাদি অফারের দ্বারা।-Neil Howe (Mar 29, 2019). Nations Labor To Raise Their Birthrates, Forbes.

>ব্রিটেনের ৮১% গর্ভপাত করে অবিবাহিত মেয়েরা।-(abortion statistics, England and Wales: 2019)

আমেরিকায় মোট জন্মের ৪৮% শিশুই বিবাহ বহির্ভূত বাবা–মায়ের সন্তান।

২০১৬ সালে ইউরোপ-আমেরিকার অর্ধেক শিশু বিবাহ-ছাড়া (out-of-wedlock) জন্ম।- https://twitter.com/spectatorindex/status/988370897955233788

যে পরিবারের ৬৫%-ই ভেঙে যায়, ভাঙার জন্যই যার সৃষ্টি। যতদিন ভালো লাগবে একসাথে থাকবে, ভালো না লাগলে থাকবে না।

এসব বিচ্ছিন্ন পরিবারের সন্তানদের স্বাস্থ্য ২০% কম,আচরণগত সমস্যা থাকে বেশি,সাইকোলজিস্টের সাহায্য প্রয়োজন পড়ে ৩০০% বেশি,আত্মহত্যা-প্রবণতার সম্ভাবনা দ্বিগুণ,স্কুলে মারামাটি ও চুরিচামারিতে লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেক অনেক বেশি,সিঙ্গেল মা-বাবা ও লিভ-টুগেদারের বাচ্চাদের ৪২%-ই স্কুলে মারপিট করে, স্কুলের রেজাল্ট খারাপ হয় বেশি,স্কুল থেকে ঝরে পড়া সম্ভাবনা দ্বিগুণ,কারাগারে যাবার সম্ভাবনা নরমাল পরিবারের চেয়ে 12 গুণ বেশি, ভবিষ্যতে কিশোর অপরাধ ও প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধের প্রবণতা...

পশ্চিমা পরিবার ব্যবস্থায় ব্যক্তিস্বাধীনতাকে মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করার ফলে কেউ অন্যের সমালোচনা কিংবা পরিবর্তন করার অধিকার রাখে না। এমনকি পিতা তার সন্তানকেও তার ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকারও রাখে না।

ইসলামে সন্তান পিতা মাতার জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বিশেষ নেয়ামত ও আমানত স্বরূপ। আর প্রকৃত মুসলিমরা কখনোই শুধুমাত্র ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাবের হয় না, বরং তারা দুনিয়া ও আখেরাতে পরিবার ও সমাজের সকলকে নিয়ে সফল হতে চায়। পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও সন্তানদের ইসলামী আদর্শে গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ সচেষ্ট থাকে, যেন সকলকে নিয়ে একই সাথে আল্লাহ তায়ালার জান্নাতে একত্রিত হতে পারে এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা পেতে পারে। তাদের নিকট সন্তান কখনো বোঝা নয় বরং আল্লাহ তাআলার বিশেষ নিয়ামত ও প্রশান্তির কারণ। ইসলামী আদর্শে গঠিত পরিবারে বেড়ে ওঠা সন্তানেরা অর্জন করতে পারে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক গুণাবলী সমূহ। তাদের এই সকল গুণাবলীর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সমাজ,সভ্যতাসহ সারা বিশ্বে। প্রকৃত মুসলিম পিতা-মাতার নিকট দুনিয়াবী খ্যাতি-উন্নতি থেকে নিজ পরিবারের সদস্য ও সন্তানদের তারবিয়াত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা নিজ পরিবার যদি ইসলামী আদর্শে গড়ে ওঠে, তখন তা সমাজ,সভ্যতা ও সারা বিশ্বের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে।

ইসলামের সম্পর্কের গভীরতার উপর ভিত্তি করে অধিকার নির্ধারিত হয়। যার সাথে পারিবারিক সম্পর্ক বেশি কাছের,সে পাবে বেশি অধিকার। যেমন মার সাথে সন্তানের সম্পর্ক সবচেয়ে নিবিড় । আর সেজন্যে মাতার সন্তানের কাছ থেকে পাবেন তিনগুণ বেশি অধিকার আর পিতা পাবেন এক গুণ।

তবে পশ্চিমাদের কাছে এই ধরনের বিশেষ অধিকার বলে কিছু নেই। এখানে ছেলে-মেয়ে মা-বাবাকে একটু বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য নয় , আর মা বাবাও সন্তানকে একটু আলাদা দৃষ্টিতে দেখবে এটাও পশ্চাতে নীতি-নৈতিকতার আওতার মধ্যে পড়ে না। অতি নিকটাত্মীয়ের বিশেষ কোন অধিকার তারা স্বীকার করে না। এখানে মা-বাবার প্রতি সন্তানের বিশেষ শ্রদ্ধাবোধের নীতি নেই। যেহেতু পশ্চিমায় সকলেই নিজের ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী, তাই সন্তানের উপর পিতা-মাতার কর্তৃত্ব থাকে না।পারিবারিক সম্পর্কের সূত্র ধরে যে বিশেষ অধিকার পাওয়া যেত, তাদের পরিবার কাঠামোতে তাও অবশিষ্ট থাকেনা।

■ নারীর মর্যাদা ও ভূমিকার তুলনা:

ইসলাম নারী সুরক্ষার ব্যাপারে এতটাই সতর্ক যে, যখন ইসলামী শাসন ব্যবস্থা ছিল, যুবতী নারী ১৩০০ কিলোমিটার একা সফর করলেও কেউ তার দিকে চোখ তুলে তাকাতো না।এছাড়াও পরিবার ও সমাজে নারীর সম্মান ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে ইসলাম। বলা হলো-মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো পবিত্র স্ত্রী, যে ব্যক্তি ছেলেকে মেয়ের চেয়ে বেশি প্রাধান্য না দেবে তার জন্য জান্নাত। উত্তরাধিকার ও নিজ সম্পত্তির উপর পূর্ণ এখতিয়ার পেল নারী একমাত্র ইসলামের মাধ্যমেই। জ্ঞান দান ও জ্ঞান লাভের অধিকার পেল, পূর্বযুগে বহু বিদূষী ও জ্ঞানী নারীর উদাহরণ আমরা পাই। যেমন: উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা, আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহা, আমরা কিন্তু আবদীর রহমান রহিমাহাল্লাহ,খাওলা বিনতু সালাবা রাদিয়াল্লাহু আনহা, যিনি একবার খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে গণ জমায়েতের মধ্যে কোরআনের দলিল দিয়ে চ্যানেল করে মত পরিবর্তনে বাধ্য করলেন খাওলা বিনতু সালাবা রাদিয়াল্লাহু আনহা।-(আল ইস্তিয়াব,পৃষ্ঠা-২৮৯)

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও নারীদের মতামতে প্রাধান্য দিয়েছে ইসলাম। যেমন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু খলিফা থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিদুষী নারীদের মতামত নিতেন, তৃতীয় খলিফা নির্বাচনে বিশেষ কিছু নারীর কাছ থেকে রায় নিয়েছেন সমন্বয়ক আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু আনহু।

ইসলাম কখনো সমতাকে মানদন্ড মানে না বরং ইসলাম সর্বদা ন্যায় ও ইনসাফের পক্ষে থাকে। যেমন ইসলামের সম্পত্তি বা মিরাস বন্টনের ক্ষেত্রে অনেকে আপত্তি তোলে যে নারীদেরকে তার যথাযথ প্রাপ্য দেয়া হয় না।

ইসলামে পুরুষকে স্ত্রী, মা ও তার অধীনস্থ নারীদের ব্যয় বহনের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। নারীকে কারো ব্যয় বহনের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। তাই নারী যা পাবে,সবটাই তার সেভিং।সেখানে কারো প্রাপ্য অংশ নেই। তবে পুরুষের টাকার প্রয়োজন বেশি এবং উপার্জন ও খাদ্যদানের জন্য তাকে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। এজন্য তাকে বেশি ভাগ দেয়া হয়। নারীর জন্য স্বামীর ভরণপোষণই যথেষ্ট। আর তার প্রাপ্য সম্পত্তি তার জন্য অতিরিক্ত। সম্পত্তির ভাগে তাকে কম দেওয়াটা অন্যায় নয়,বরং ন্যায় সঙ্গত।

পাশ্চাত্য সভ্যতায় নারীদের মর্যাদা ও উন্নয়নকে মাপা হয় জিডিপি আর জিএনপির স্কেলে। যে সকল নারী পরিবারের ভূমিকা রাখে, পরিবারে অবস্থান করে তাদের মূল্যায়ন পাশ্চাত্য সমাজে দেয়া হয় না। জিডিপি ও জিএনপির উন্নয়নের স্বার্থে নারীকে ঘর থেকে বের করে কর্মস্থলে আনতে পারাটাই যেন মুখ্য। দেহ বিক্রি করে,পুরুষ–নারীর মিশ্র পরিবেশে কাজ করে, যেসব নারী কথিত ক্যারিয়ার গড়ছে;নারীবাদের দৃষ্টিতে তারাই সফল। এছাড়াও আধুনিক সময় নারী-পুরুষের চেয়ে সমতা দাবি তোলা হচ্ছে, তা কোনভাবে নারী-পুরুষের মাঝে ইনসাফ তো করছেই না বরং তা সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্যে বিপরীত।

পশ্চিমা সভ্যতা বুঝাতে চাই তারা সমতা রক্ষার জন্য নারীদের কর্মক্ষেত্রে নিয়ে আসতে চায়, বাস্তবে চাকরির জন্য তাদের প্রার্থী বৃদ্ধির প্রয়োজন তাই "নারীদের শ্রম বাজারে নিয়ে এসো, নারীকেও ক্রেতা বানাও ভোক্তা বানাও, নারীকে নির্ভরশীল না রেখে স্বাবলম্বী করো"-এ ধরনের

বুলি আওড়ায়। তাদের কাছে যেহেতু কারেন্সি বা বিনিময়ই মুখ্য,তাই প্রেম-ভালোবাসা, মমতা ও দায়িত্ববোধের সেখানে কোন কদর নেই। বরং পরিবারকে খুশি রাখা, সংসারের প্রতি মনোযোগী হওয়া, সন্তান প্রতিপালন- তাদের কাছে পরাধীনতা মনে হয়, নগদ বিনিময় প্রাপ্তিই তাদের কাছে স্বাধীনতা। অথচ এই সভ্যতার জেরেই নারীরা দিন দিন ভোগ্যপণ্যে পরিণত হচ্ছে এবং অন্যায়ের শিকার হচ্ছে।

>>আমেরিকাতে প্রতি পাঁচজনে একজন হাইস্কুলের ছাত্রী তাদের প্রেমিকের দ্বারা যৌন নিগ্রহের শিকার।

>>২০-২৫ শতাংশ নারী তাদের কলেজ জীবনে ধর্ষণ কিংবা ধর্ষণ চেষ্টা শিকার হচ্ছে।

>>আমেরিকার ৮১% নারী যৌন হয়রানির শিকার, তার ৩৮ শতাংশ যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটেছে কর্মস্থলে।
>>পতিতাদের মাঝে ৭১% শারীরিক প্রহারের শিকার, আর ৬২% নিয়মিত ধর্ষণের শিকার। ৮৯% এই অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি চায়, কিন্তু তাদের আর উপায় নেই (Farley et al.2003)

অথচ ইসলামের দর্পনে দেখলে দেখা যাবে নারীর সামাজিক ও পারিবারিক অধিকার,তার মাতৃত্ব সংরক্ষণ, পরিবার গোছানো,সন্তান প্রতিপালন, শিশুরসুস্থতা ও পূর্ণাঙ্গ মানসিক বিকাশের মাঝেই আছে তাদের উন্নতি। ইসলামে নারীর মর্যাদার সাথে মাথাপিছু আয় বাড়ানো কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামে নারীর মর্যাদা ও ভূমিকা বাজার মূল্যের বৃদ্ধির চেয়েও অনেক ঊর্ধ্বে। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ছোট একটি বাক্যে কত সুন্দর মূল্যায়ন করেছেন। তিনি বলেন: “তোমরা একে অন্যের পরিপূরক,একজনের কমতিকে আরেকজন পূরণ করো, এভাবে তৈরি হয় পরিপূর্ণতা।’-(সূরা বাকারা; আয়াত: ১৮৭)

■ সমাজে ও আধুনিক বিশ্বে ইসলামী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের পার্থক্য:

পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। পাশ্চাত্যের সংজ্ঞায়িত উন্নতি ও পুঁজিবাদে যে এগিয়ে তাকেই এই সভ্যতা মূল্যায়ন করে। এছাড়া বাকিরা এই সভ্যতার কাছে মূল্যহীন।আর ইসলামে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী সেই হবে, যে তাকওয়ার অধিকারী হবে যদিও সে পুঁজিহীন হয়।পশ্চিমের এই ব্যক্তি কেন্দ্রিক নীতির ফলে সমাজব্যবস্থায় নানা ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। সমাজে ভালো মন্দের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা থাকে না। ব্যক্তি নিজেই সকল কিছুর ভালো-মন্দ নির্ধারণ করে। তাদের কাছে জীবন মানেই ভোগ বিলাস।পাশ্চাত্য শিক্ষা মুসলিমদেরকে করেছে দর্শনহীন ও উদ্দেশ্যহীন, আর শিখিয়েছে শুধু আয় আর ভোগ।এর ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা,অশ্লীলতা,অবাধ্যতা ছড়িয়ে পড়ে। সমতা,স্বাধীনতা ও প্রতিযোগিতার বেড়াজালে পরিবার ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।

আমরা পূর্বেই জেনেছি, মানব সৃষ্ট খ্রিস্টধর্মের অন্যায় অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে ইউরোপ তাদের জীবন ব্যবস্থা থেকে ধর্মকেই বিদায় জানায়। কিন্তু সেই মুক্তি ইসলামই আমাদের দিয়েছে সেই সাড়ে ১৪০০ শত বছর পূর্বে, জাহেলিয়াত থেকে মুক্তি দিয়ে হিদায়াতের আলোর পথ দেখিয়েছে।ইসলাম কেবল বিশ্বাস ও প্রথা অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নয়, বরং পরিবার রাষ্ট্র সমাজ বাজার যুদ্ধ বিচার সবকিছুই ইসলামের আলোচ্য বিষয়। ইসলামই একমাত্র দ্বীন, যা সকল ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।ইসলামে দুনিয়া আখেরাতের শস্যক্ষেত্র বা পরীক্ষাগার হিসেবে বিবেচ্য।পাশ্চাত্য সভ্যতা সমতার নামে অবিচার করে ,সেখানে ইসলাম শিখায় সুষমতা। পাশ্চাত্য সভ্যতা শিখায় সর্বোচ্চ ও সর্বাধিকের উপভোগ, আর ইসলাম শিখায় সংযমি ভোগ। ইসলাম সমতার কথা বলে না কিন্তু ইনসাফ,আদল তথা ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে, যা সমতা নয় বরং প্রত্যেকের অবস্থা ও দায়িত্বের পরিধি বিচার করে সিদ্ধান্ত দেয়।

তাই ইসলামের অনুসরণে যে সমাজ কাঠামো ও সামাজিক ঐক্য গড়ে ওঠে, অন্যান্য কোন সভ্যতায় এমন নজির পাওয়া যায় না। ইসলামী শরীয়া মানুষের আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক উভয় জীবন গুরুত্বের সাথে দেখে। ফলে এই সমাজ কাঠামোতে মানুষ বাহ্যিক জীবনকে এমনভাবে গুছিয়ে নিতে পারে যে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথেও কোন বাধা সৃষ্টি হয় না। ইসলাম আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালবাসতে শেখায়, আল্লাহর জন্যই একে অপরের মাঝে ভ্রাতৃত্ব গঠন

হয়।তাকওয়ার ভিত্তিতে আল্লাহ তাআলার নিকট মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। ধনী গরীব বৈষম্য,বর্ণবাদ, জাতীয়তাবাদের বৈষম্য একমাত্র এই ব্যবস্থাতে নির্মূল হয়। পরিবার, আত্মীয়,প্রতিবেশীদের যথাযথ হক আদায় হয় একমাত্র ইসলামী ব্যবস্থাতেই। দৃষ্টি সংযম,লজ্জাশীলতা,পর্দা ও নৈতিক শিক্ষার ফলে সমাজ থেকে অশ্লীলতা দূর হয়। ন্যায়-নৈতিকতা, সত্যবাদিতা ও ইনসাফের ভিত্তিতে সমাজ থেকে অন্যায় অপরাধ হ্রাস পায়।

ইসলাম বিশ্বাস করে মূলনীতিবিহীন লাগামছাড়া চিন্তা- নানাসমস্যা ও পরস্পর বিরোধী বহু মতবাদ সৃষ্টি করে। তাই প্রয়োজন পরিপূর্ণ মূলনীতি, আর সেটিই হল ওহী। মানব যুক্তি যেখানে শেষ, সেখানেই এই মূলনীতি ও বিশ্বাসের শুরু। সাহাবীগণ কেউই না বুঝে ঈমান আনেননি,বরং এই ঈমানের যাত্রা শুরু হয় যখন আল্লাহর কুদরতের কাছে ওনাদের যুক্তি ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পরাস্ত হয়েছে।

তবে ইসলাম কখনোই কুসংস্কার বা সারহীন প্রথা অনুসরণের, বরং যুক্তি,চিন্তাভাবনা ও বিচারবুদ্ধির সাথে অনুসরণের দিকনির্দেশনা দেয়।
আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

অর্থ: “পড়ুন আপনার رب-এর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।”

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

অর্থ: “যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।”-(সূরা আলাক, আয়াত-১,৪)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন:

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

অর্থ: “তাহলে কি তোমরা চিন্তা করো না?”-(সূরা আলি ইমরান: আয়াত-৬৫)

জ্ঞান ও বিজ্ঞানেও পাশ্চাত্যের আগেই উন্নতির পিছনে মুসলিমদের ভূমিকাই অধিক। রেনেসাঁস সময়কালে ইসলামী সভ্যতার সান্নিধ্যে এসে পশ্চিমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ ঘটে।মুসলিম সভ্যতায় বিজ্ঞান চর্চার কারণ ছিল একমাত্র ইসলাম।ইহুদি প্রাচ্যবিদ Hartwig Hirschfeld-এর একটি উক্তি এ ব্যাপারে যথেষ্ট-

“আল কুরআন কে যে জ্ঞান ধারার উৎস মূল হিসেবে বিবেচনা করা হয়, এটা দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আকাশ পৃথিবী থেকে শুরু করে মানব জীবন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রবৃদ্ধির সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয় এখানে স্থান পেয়েছে। ফলে এ পবিত্র গ্রন্থের বিভিন্ন অংশের ব্যাখ্যা হিসেবে রচিত হয়েছে বিষয় ভিত্তিক অগণিত প্রবন্ধ রচনা। এভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর ব্যাপক আলোচনা এবং পরোক্ষভাবে মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞানের নানা শাখার বিস্ময়কর অগ্রগতির নেপথ্যে ভূমিকা আল-কুরআনেরই।...একইভাবে কুরআন চিকিৎসা বিদ্যার জন্য একটা উদ্দীপনা জুগিয়ে ছিল, সামগ্রিকভাবে উৎসাহ দিয়েছিল প্রকৃতির নিবিড় পর্যবেক্ষণকে।”

ইসলামী শরীয়তের উত্তরাধিকার বন্টনের সমাধান করতে গিয়ে তৈরি হয় বীজগণিত।
সালাতের কিবলা ঠিক করা,সময় নির্ধারণ ও ইসলামী ক্যালেন্ডার উদ্ভাবনের জন্য শুরু হয় জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, গোলীয় জ্যামিতি ও গোলীয় ত্রিকোননীতি চর্চা।(Gingerich,1936)।কেবল আসরের সালাতের সময় বের করতে গিয়ে মুসলিমরা নতুন নতুন প্যারামিটার আবিষ্কার করে।

“আল্লাহ এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেননি যার চিকিৎসা সৃষ্টি করেননি”-(সহি বুখারী-৫৬৭৮)
এই হাদিস থেকে মুসলিম চিকিৎসকরা উদ্বূত হয়েছিলেন গবেষণায়, বিভিন্ন সভ্যতার চিকিৎসা বিদ্যা অনুবাদ ও বিশ্লেষণে।

ইসলামের মতো অন্য কোন ধর্মই বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের ব্যাপারেও এতটা উৎসাহ দেয়নি।এর গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন আমরা পাই উমাইয়া ও আব্বাসী খেলাফতের আমলে। আরবদের শাসন চলাকালে।

এভাবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের অবিস্মরণীয় অবদান রয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের উচিত আমাদের সে সোনালী অতীতকে পুনরায় উজ্জীবিত করা। সমাজ ও পরিবারে ইসলামী সভ্যতার জাগরণ তৈরি করা। পশ্চিমা ভ্রান্ত ও উদ্ভট দর্শন ও চিন্তা চেতনা থেকে নিজেদের পরিবার ও সমাজকে সতর্ক করা। তাহলে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হবে প্রকৃত উন্নতি ও শৃঙ্খলা।

■ নৈতিকতা ও আত্মিক শান্তি: ইসলামের সৌন্দর্য:

ইসলামের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মানুষের নীতি নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটানো। কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতার অবস্থান ঠিক এর বিপরীত। ব্যক্তি স্বাধীনতা,উন্নয়ন ও সমতার প্রতিযোগিতায় তারা নৈতিকতাকে ছুড়ে ফেলেছে বহু আগেই।

পশ্চিমা সভ্যতা কখনো নাজাতকে মানবজীবনের সার্থকতা মনে করে না,তাদের কাছে পার্থিব কল্যাণ বা সুখই জীবনের মূল উদ্দেশ্য। তারা কেবল শিখিয়েছে আয় আর ভোগ, ফলে মানুষের মাঝে হতাশা, অস্থিরতা,আরোগ্যহীন অসুখ, আত্মহত্যা, ড্রাগ, অপরাধ বৃদ্ধি, ডিভোর্স ইত্যাদি বৃদ্ধি পেয়েই যাচ্ছে।এখানে যে যার মত করে ভালো মন্দের সংজ্ঞা বানিয়ে নিবে, আবার একে অপরের ধারণার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। কেউ কাউকে ভালো মন্দের উপদেশ দেয়ার অধিকার রাখবে না। এমন মানদণ্ডের ফলে পৃথিবীতে মন্দ বলে কিছু থাকছে না। যে যার নীতি অনুযায়ী ভালো-মন্দ নির্ধারণ করবে।

পাশ্চাত্য যেখানে শেখায় সীমাহীন খায়েশ ও চাহিদা পূরণ তথা নফসের পূজা, ইসলাম শিখায় অল্প তুষ্টির চেতনা। ইসলাম শিখায় স্রষ্টার তাওহীদকে উপলব্ধি ও তাঁর বিধানের সামনে নিজেকে সমর্পণ করলে তবেই মানুষ তার মৌলিক ও উত্তম গুনাবলীতে বিকশিত হতে পারে। ব্যক্তিগত উত্তম গুণাবলী বিকশিত করার মাধ্যমে আমরা ইহকালেও পূর্ণতার সর্বোচ্চ স্তরে পৌছতে পারব এবং আধ্যাত্মিক দিক ঠিক রেখেও দুনিয়ার জীবনকে শতভাগ কার্যকরী করতে সক্ষম হব।

ইসলামে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর দাসত্বের প্রমাণ দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কেবল নামাজ,রোজাই ইবাদত নয়;বরং ব্যবসা-বাণিজ্য হাঁটাচলা, খাওয়া-দাওয়া এমনকি টয়লেটে যাওয়াটাও আমাদের জন্য ইবাদত হিসেবে গণ্য হতে পারে, যদি আমরা আল্লাহর বিধানও নবীজির সুন্নাহ অনুযায়ী তা পালন করতে পারি। যত দুঃখ কষ্ট কিংবা সুখ সমৃদ্ধিকর অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা জীবন অতিবাহিত করি না কেন প্রতিটি ক্ষণে আমাদের জন্য মূল্যবান। আমরা যদি আল্লাহর ফয়সালের উপর সন্তুষ্ট থেকে আমাদের জীবন পরিচালনা করতে পারি তাহলে প্রতিটি ক্ষণে অর্জন করব অশেষ নেকি। প্রতিটি মুহূর্ত হয়ে যাবে ইবাদত, আমাদের জন্য বয়ে আনবে কল্যাণ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"মুমিনের বিষয়টি বড়ই বিস্ময়কর! তার সবকিছুই কল্যাণকর। মমিন ছাড়া অন্য কারো ক্ষেত্রে সেটি প্রযোজ্য নয়। তার জীবনে সুখ-সমৃদ্ধি এলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ফলে তা হয় তার জন্য কল্যাণকর। আর দুঃখ-দুর্দশার মুখোমুখি হলে ধৈর্য ধারণ করে, ফলে তাও হয় তার জন্য কল্যাণকর।"-(সহীহ মুসলিম; ৭২২৯)

মুসলিম সমাজে পশ্চিমা প্রভাব বিস্তারের পথ ও কারণসমূহ

■ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে:

আমাদের জেনারেল কারিকুলামের শিক্ষাব্যবস্থা ব্রিটিশ প্রণীত। আমাদের মাঝে তাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য হলো আমরা যেন নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে, ইসলামী মানদন্ডের সাথে সাংঘর্ষিক ইউরোপীয় চিন্তা চেতনাকে লালন করি।

যে শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল লিখতে-পড়তে পারা,শৃঙ্খলা শেখানো আর নৈতিক চরিত্র গঠন; তার উদ্দেশ্য পরিণত হলো পুঁজিবাদী কর্মী তৈরি, পুঁজিবাদী নারীকর্মী তৈরি, যারা ধর্মকে ফেলে নিজের নৈতিকতার মাপকাঠি নিজে ঠিক করবে, খ্যাতি-অর্থ-পদ আধুনিকতার দাসে পরিণত হবে।

উপনিবেশের মাধ্যমেও যখন ভারতীয়দের মধ্যে আবহাওয়াগত, ধর্মীয় ও রুচিবোধের পার্থক্যের কারণে নিজেদের পুঁজিবাদ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারছিল না, তখন তারা এমন নীতি অনুসরণ করে যার ফলে স্থানীয়দের রুচিবোধেরই পরিবর্তন ঘটে। আর শিক্ষা একটি জাতির মতাদর্শ ও রুচিবোধে প্রভাব ফেলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ইউরোপীয়রা শিক্ষাব্যবস্থাকে নিজেদের হাতিয়ার বানিয়ে নেয়। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ষাট বছরে এক প্রজন্মের ব্যবধানে ২০ লক্ষ ক্রেতা তৈরি করে ফেলা হলো রুচির পরিবর্তন ঘটিয়ে। ভারতবর্ষ হয়ে গেল বৃটেনের প্রধান বাজার।
যেমনটি লর্ড মেকলের উক্তিতেও ফুটে ওঠে-

“(১৮৩৫-এর শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা এমন প্রজন্ম তৈরি হবে) এরা হবে এমন একটা শ্রেণি, যারা রক্তে গায়ের রঙে তো ভারতীয়, কিন্তু রুচি-মতামত-নীতি বিচারবুদ্ধিতে হবে itইংরেজ।”

“বর্তমানে এমন একটি শ্রেণি তৈরি করার জন্য আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা নেওয়া উচিত, যারা আমাদের ও আমাদের মিলয়ন মিলয়ন প্রজাদের মাঝে ভাষ্যকার হিসেবে কাজ করবে।"

" এই শ্রেণীর কাছে আমরা দায়িত্ব দেব তাদের দেশের প্রচলিত কথাগুলোকে সংস্কার করার এবং পশ্চিমা পরিভাষা নিয়ে তাদের স্থানীয় ভাষাগুলোকে সমৃদ্ধ করার"

-অর্থাৎ তাদের উদ্দেশ্য কখনো শিক্ষার প্রসার নয়, বরং ভারতীয়দের মাঝেই এমন এক শ্রেণী তৈরি করা,যারা তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবে, এমনকি ইউরোপ সভ্যতার বিদায় ঘটলেও। আর এমনই ঘটলো, ব্রিটিশরা শিক্ষার মাধ্যমে এমন এক শ্রেণি তৈরি করে ক্ষমতা দিয়ে গেল তাদেরই যারা চামড়ায় ভারতীয় মগজে ব্রিটিশ।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা সে পথের অনুসারী। এই শিক্ষার ফলে আমাদের মন মস্তিষ্ক এখন কোরআন হাদিসের জ্ঞানকেউ পাশ্চাত্যের দর্পণে বিবেচনা করে। কোরআন-হাদীস শরিয়া নিয়ে পড়তে গেলে ইসলামের বিধি বিধান নিয়ে নানা প্রশ্ন মনে উত্থাপিত হয়। এই শিক্ষার ফলে আলিমগনের প্রতি বিদ্বেষ তৈরি হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাদের এই শিক্ষাব্যবস্থার ফলে মুসলিমরা পরিণত হচ্ছে তাদের মানসিক দাসে।
১৯ মে, ২০২০-ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে ৪২৮ কোটি টাকার ঋণ দিয়েছে (ইনকিলাব)। এই ইউরোপীয় ইউনিয়নী সমকামিতা বৈধকরণে কাজ করে যাচ্ছে।এই শিক্ষার ফলে তৈরি হচ্ছে নারীবাদী। সমকামিতা ও নারীবাদীর ফলে আমাদের পরিবার কাঠামো হয়ে পড়ছে দুর্বল ও ভঙ্গুর।

এই শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের পরিবার ও সমাজ ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে তারা প্রভাব খাটাচ্ছে, নিজেদের চিন্তা-চেতনা আমাদের মাঝে প্রবল ভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এছাড়াও মুসলিম দেশের শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য ঐ সকল দেশে গমন করে। ফলে তাদের দর্শন চিন্তা চেতনা ধারণ করে, মুসলিম দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রচার করছে। এই কারণে আমরা বাংলাদেশের বহু শিক্ষার্থীদের মাঝে দেখতে পাই তারা কিভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি ঝুঁকে পড়ছে।

■ পাশ্চাত্য সমাজ ব্যবস্থায় বসবাসের প্রভাব:

পরিবেশ মানুষকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম।সেকুলারিজম ও লিবারেলিজম সমাজ ব্যবস্থায় দীর্ঘ সময় বসবাসের কারণে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে পশ্চিমা নৈতিকতা ও দর্শনকে পরম সত্য মনে করার মনোভাব তৈরি হচ্ছে। ফলে কোন ব্যাপারে যখন পশ্চিমা কাঠামোর সাথে ইসলামের সাংঘর্ষিকতা দেখা দেয়, তখন তারা ইসলামের ব্যাপারেই সংশয়ে পড়ে যায়। অধিকাংশের ক্ষেত্রে ইসলামী অবস্থা প্রত্যাখ্যান করে কার পশ্চিমা কাঠামো মেনে নেয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। তাদের সাথে বসবাসের ফলে নিজেদের আচার-আচরণ,সংস্কৃতিতে প্রবল ভাবে পরিবর্তন দেখা দেয়। ফ্রি মিক্সিং, নারী পুরুষ সমতা, সমকামিতা ইত্যাদি স্বাভাবিক হতে থাকে। মুসলিম কমিউনিটির অভাব ও শিক্ষার মাধ্যমে তাদের মাঝে তৈরি হয় ইসলাম নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন।

মুসলিম সমাজ ত্যাগ করে যেখানে ইসলামবিরোধী চিন্তা-ভাবনা কার্যক্রমের সয়লাব, সে সকল পরিবেশে বসবাস করতে গেলে রাষ্ট্রচিন্তায় ছাড় তো দিতেই হয়, পারিবারিক ইসলামিকসহ ব্যক্তিগত আচারেও ছাড় দিতে হয়। এছাড়াও তাদের সাথে ওঠাবসা ধরুন সহমর্মিতার সৃষ্টি হয়, কুফরকে নির্দোষ মনে হয় ও তাওহীদকে আবশ্যিক বলে মনে হয় না,দ্বীনি গায়রত চলে যায়, দ্বীনের প্রতি হীনমন্যতা সংশয় অবশেষে ধর্মত্যাগ। সেখানে বসবাসকারী অনেককে বলতে শোনা যায়, তারা সেখানে স্বাধীনভাবে ইসলাম পালন করতে পারছেন, বাস্তবে তারা নিজেরা পালন করতে পারলেও পরবর্তী প্রজন্মগুলোতে ইসলাম হারিয়ে যায়। পিতা-মাতা এখানে স্বাধীনভাবে সন্তানকে ইসলামের বিধি-নিষেধের ব্যাপারেও কিছু বলতে সক্ষম হয় না, কেননা ব্যক্তি স্বাধীনতার জোরে সন্তান এতে অসন্তুষ্ট হলে আইনি ব্যবস্থা মা-বাবার বিরুদ্ধে নিতে পারে।

সাধারণ মুসলমানের পাশাপাশি ঐ সকল সমাজে বসবাসকারী অনেক আলেম,তালেবুল ইলম, ইসলামিক স্কলার ও বুদ্ধিজীবীদের মাঝেও এ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে সকল বিষয়ে সাংঘর্ষিকতা সৃষ্টি হয়, সে সকল বিষয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সঠিক প্রমাণ করতে যেয়ে তারা এমন সব ব্যাখ্যা হাজির করছে, যা সালাফদের মাঝে এর কোনো অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এই সকল ব্যাখ্যা সাধারণ মুসলিমদের মাঝে প্রচার- প্রসার হওয়ার ফলে তারা শিক্ষাকে পাশ্চাত্য দর্শনের মানদন্ডে বিচার করার প্রবণতা তৈরি হচ্ছে।

■ ইসলামী জ্ঞান অর্জনে অনীহা ও আত্মপরিচয়ে হীনমন্যতা:

ইসলাম নিছক কোন সংস্কৃতি নয় বরং এটি সকল যুগের সকল স্থানের মানুষের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ বিধান। ইসলামকে কোন ধর্ম বিশ্বাসের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখে যদি বুদ্ধিভিত্তিক ভাবে দেখা হয় তাহলে যে কেউ পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে হেদায়েত অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। এই দিন পূর্ববর্তীদের কাছে ছিল বেঁচে থাকার প্রেরণা। অথচ আমরা এই দিনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছি, এই দিন নিয়ে লজ্জাবোধ করি। আমাদের মাঝে তৈরি হয় আত্মপরিচয়ে হীনমন্যতা। মূলত পশ্চিমাদের ক্ষমতার দাপট, তথাকথিত উন্নতি ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রতি মুসলিমদের অধিক ঝোঁক বিশেষভাবে দায়ী। পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও তাদের দর্শনকে আপন করে নেয়ার ফলে, দ্বীন ইসলাম ও তার সোনালী অতীত থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাচ্ছি। ইসলামকে কেবল অন্তরে বিশ্বাস এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি। ইসলামকে মানুষের ব্যক্তিগত সামাজিক জীবনের জন্য বাধলে তো একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মেনে নিতে পারিনি।

এর একটি প্রধান কারণ হলো আমাদের দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব।জ্ঞানের অভাব ও পরাজিত মানসিকতার কারণেই আমাদের শিশু,তরুণ ও যুবকরা সাহাবায়ে কেরাম, সালাম অপূর্ব শরীরের জীবন বৃত্তান্ত দেখে অনুপ্রাণিত হয় না।ইসলামের বিষয়ে আমাদের পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান না থাকায় এবং পাশ্চাত্য দর্শনে প্রভাবিত হওয়ার ফলে, আমরা আমাদের শরীয়ত নিয়ে হীনমন্যতায় ভুগি। আমরাই আমাদের শরীয়তকে একরকম উগ্রতা, গোঁড়ামি ও বেইনসাফী মনে করি।

দুনিয়ামুখীতা বৃদ্ধি ও জাগতিক ব্যস্ততার ফলে আমরা ও আমাদের পরিবার ইসলামের জ্ঞান অর্জন থেকে বিমুখ হয়ে আছি। মূলত আমাদের উপর পাশ্চাত্যের প্রভাবের কারণে আমরাও আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভোগবাদ ও উন্নতির নীতি মেনে চলছি। দুনিয়ার সুখই এখন আমাদের কাছে মুখ্য। দুনিয়ার জীবন যে ক্ষণস্থায়ী এবং আখিরাতের শস্যক্ষেত্র, তা আমরা ভুলতে বসেছি। আমাদের জীবনের যে মূল উদ্দেশ্য দুনিয়ার জীবনকে আল্লাহ তাআলার বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করে আখিরাতের চিরস্থায়ী সাফল্য অর্জন করা, সে উদ্দেশ্য এখন আমাদের কাছে গুরুত্বহীন। তাই ইসলামের জ্ঞান অর্জনের প্রতি আমাদের চরম অনিহা।

অথচ কোন ধর্ম কিংবা সভ্যতা জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে এতোটা গুরুত্ব দেয়নি, যতোটা ইসলাম দিয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

অর্থ: "পড়ুন আপনার رب-এর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

অর্থ: "যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন।"-(সূরা আলাক, আয়াত-১,৪)

আমাদের এহেন উদাসীনতার ফলে, আমরা আমাদের ইসলামকে চিনতে পারিনি। ইসলামই যে একমাত্র সত্য জীবন ব্যবস্থা এবং একমাত্র ইসলামের জন্যই যে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন হবে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না। ইসলামের অতীত সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার দরুন, আমরা জানতে পারি কি যে, এই ইসলামের জন্যই যে এই পৃথিবী একসময় উন্নতি ও শৃঙ্খলার শীর্ষে পৌঁছেছিল। ফলে আমাদের মাঝে বিরাজ করে আত্মপরিচয়ের হীনমন্যতা ও নিজেদের শপে দিয়েছি পাশ্চাত্যের দাসত্যে।

আমাদের এই দুর্বলতার যথাযথ ফায়দা লুটে নিচ্ছে পাশ্চাত্য সভ্যতা। আমাদের উপর তাদের প্রভুত্ব রাজত্ব করছে। বিভিন্ন ষড়যন্ত্র ও কৌশলে, আমাদের পরিবার ও সমাজে নিজেদের চিন্তাধারা ও দর্শন ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমরা যদি এখনো এই সকল বিষয়ে সতর্ক না হই, তাহলে অতি শীঘ্রই আমরা পরিণত হব পৃথিবীর দুর্বল জাতিতে।

■ পশ্চিমাকে "উন্নত সবকিছু" মনে করা:

আজকের ইউরোপ আমেরিকা এনলাইটেনমেন্ট অর্থাৎ সমতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, যুক্তির প্রভুত্ব, বিজ্ঞানবাদ ইত্যাদির জন্য উন্নত নয়। বরং উন্নত হয়েছে পুঁজিবাদ,ভোগবাদ, উপনিবেশের মাধ্যমে ভারতের সম্পদ লুটপাট, কোটি কোটি নেটিভ এর জীবন ও পাশবিকতার দরুন।

ব্রিটিশ ব্যবসায়ী William Bolts তার considerations on India affairs পত্র সংকলনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভয়াবহ লুটপাটের খতিয়ান তুলে এনেছেন। তিনি লেখেন,
"পুরো দেশ জুড়ে শিল্প শ্রমিকদের উপর হেন অত্যাচার নেই, যা করা হতো না। অত্যাচারের পরিমাণ বাড়তেই থাকতো, বিশেষ করে তাঁতিদের উপর। তাতি,দালাল ও পাইকারদেরকে উৎপাদন সংগ্রহের কোটা পূরণ না হবার জন্য গ্রেপ্তার, জেল, মোটা জরিমানা, চাবুকপেটা এবং নিজ ভূমি থেকে বহিষ্কার করা হতো। কম উৎপাদন করলে তাঁতিদের পণ্য ছিনিয়ে নেয়া হতো দাম ছাড়াই। শিল্পীদের উপরও এরকম অত্যাচার হতো। এমন ঘটনাও জানা গেছে এই বাধ্য শ্রম থেকে বাঁচতে টাতিরা নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুলি কেটে ফেলেছে। লর্ড ক্লাইভের সময় তো আর্মেনিয় বণিকদের কারখানা ঘুরিয়ে দিয়ে রেশম চাষাদের আনা হয়েছে।"-(পৃষ্ঠা: ১৯৪)

এভাবেই তারা শিল্পোন্নত ভারতবর্ষ বাংলাকে কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত করে, আর নিজেরা এই দেশের শিল্প,সম্পদ,অর্থ লুট করে হয়ে ওঠে শিল্পোন্নত দেশ। অথচ আমরা ভেবে নিয়েছি তারা এনলাইটেনমেন্ট ও উন্নত আবিষ্কার দ্বারা উন্নত হয়েছে।
তারা ৪.৫ কোটি মানুষকে দাস বানিয়ে রেখেছে ব্যবসার খাতিরে, প্রতিবছর দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ থেকে ২০ লক্ষ শিশু ইউরোপে যুক্তরাষ্ট্রের পাচার হয়, পূর্ব ইউরোপ থেকে প্রতি বছর বহু নারী ও শিশু আমেরিকা তে পাচার করা হয় পর্নোগ্রাফির জন্য। এগুলোই তাদের তথাকথিত এনলাইটেনমেন্টের আসল রূপ।

উপনিবেশকালীন আমাদের ধন সম্পদের পাশাপাশি আমাদের মন-দিল,বুদ্ধিও ডাকাতি করে নিয়ে গেছে ইউরোপীয়রা। এখনো তাই করে যাচ্ছে। তাই আমরা তাদের তথাকথিত উন্নতি, স্বাধীনতা, প্রযুক্তি দেখে, ইউরোপীয় প্রভুত্ব গ্রহণ করে নিচ্ছি। এই প্রভুত্ব গ্রহণের আরেকটি প্রধান কারণ হচ্ছে, তাদের এই নির্মম ইতিহাস নিয়ে আমরা অজ্ঞাত। তাদের মেকি ও এক পাক্ষিক ইতিহাস

দিয়ে আমরা প্রভাবিত। এছাড়াও তাদের দাসত্ব গ্রহণ করা গণমাধ্যম ও ডিজিটাল প্লাটফর্ম এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

■ গণমাধ্যম ও ডিজিটাল প্লাটফর্মের প্রভাব:

পশ্চিমা সভ্যতা মূলত দাজ্জালের আবির্ভাবের মঞ্চ প্রস্তুতকারী ফেতনা। এর উদ্দেশ্য দাজ্জালের আবির্ভাব এর পূর্বে মুসলিমদের ফেতনায় ফেলে, ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও বিষয়াবলি থেকে দূরে নিয়ে আসা। আর এর মূল পরিচালক হল ইহুদী সম্প্রদায়, যারা ভবিষ্যতেও দাজ্জালের সহযোগী ও সহযোদ্ধা হবে। আর এক্ষেত্রে ইহুদি সম্প্রদায়ের সহযোগী হলো খ্রিষ্টান সম্প্রদায়।

তাদের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য গণমাধ্যম ও ডিজিটাল প্লাটফর্ম একটি প্রধান মাধ্যম।পাশ্চাত্য দ্বারা পরিচালিত মিডিয়া গুলো হল দাস তৈরির কারখানা, তারা নানা কৌশলে আমাদের মাঝে পাশ্চাত্য চিন্তাচেতনা ধীরে ধীরে জাগ্রত করছে,শিখাচ্ছে কিভাবে পাশ্চাত্যের গোলাম হতে হয় এবং ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ তৈরিতে এটি একটি প্রধান ভূমিকা পালন করছে।

তাদের পাপেট সংবাদমাধ্যম সমূহ প্রতিনিয়ত ইসলামবিরোধী নানা সংবাদ প্রচার করছে। এই সকল সংবাদে মূলত স্থান পায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সংবাদ এবং ওই সকল খারিজী কিছু গোষ্ঠীর কর্মকান্ড,যাদের সাথে মূলত ইসলামের কোন সম্পর্কই নেই। এছাড়াও তারা ইসলাম বিরোধী নানা কন্টেন্ট, সিনেমা,নাটক তৈরি করে যেন, অমুসলিম মুসলিম সকলের মাঝে ইসলামের একটি ভুল প্রতিচ্ছবি তৈরি করতে পারে। কেননা একমাত্র ইসলামই, তাদের তৈরি করা সকল পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র রুখে দিতে পারে। এজন্য তারা ইসলামকে তাদের প্রধান শত্রু মেনে নিয়েছে।

বর্তমানে স্মার্টফোন, ইন্টারনেটের মত উন্নত প্রযুক্তির সাথে আমরা ছোট বড় সকলেই প্রতিনিয়ত অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই সকল মাধ্যম যেন আবশ্যক হয়ে গিয়েছে। ফলে এই সকল মাধ্যমের দ্বারা আমাদের মাঝে তাদের এই সকল কর্মকান্ড সহজেই উপস্থাপিত হচ্ছে। আর যেহেতু বেশিরভাগ মুসলিম পরিবারে সঠিক দ্বীন চর্চা ও দ্বীনি জ্ঞানের অভাব, তাই

তাদের এই সকল সংবাদ,নাটক, সিনেমা কন্টেন্ট সমূহ সেই সকল পরিবারের সদস্য,পরিবারের শিশু কিশোরদের সহজেই প্রভাবিত করতে পারছে,তৈরি হচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষ ও পাশ্চাত্যের প্রতি ঝোঁক, ফেঁসে যাচ্ছি দাজ্জালের অনুসারী পাশ্চাত্যদের সকল ষড়যন্ত্রমূলক ফাঁদে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো,পাশ্চাত্যের ফেতনা কেমন হবে?তিনি বললেন, "তা তো হবে আরো অধিক ভয়ঙ্কর"-(মু'জামে তাবারানী)

■ পুঁজিবাদ ও ভোগবাদ সমাজব্যবস্থা:

বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আমরা এখন যে চূড়ান্ত উন্নতির শিরায় দেখি। বস্তুত পূর্বে তাদের অবস্থা বিপরীত ছিল। ব্যবসার ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনই। আবহাওয়াগত,ধর্মীয় ও রুচির পার্থক্যের কারণে, তাদের পণ্য গ্রহণ করত না। ফলে তারা এমন নীতি অনুসরণ করে যেন, স্থানীয়দের রুচিবোধই পরিবর্তন হয়ে যায়। এতে তারা সফলও হয়, শিক্ষাব্যবস্থা, বিজ্ঞানবাদ ও দর্শনের মাধ্যমে এমন এক শ্রেণী তৈরি করে, যারা রক্ত মাংসতে তো ভারতীয় তবে মস্তিষ্কে ব্রিটিশ। আজ এ দেশ থেকে ব্রিটিশরা বিদায় নিয়েছে ঠিকই, তবে এই শ্রেণী এখনো তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এভাবেই ভারতবর্ষ হয়ে গেল তাদের প্রধান বাজার।

আজ আমরা পুঁজিবাদকে নিজেদের দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি, অর্থাৎ এটি এখন আর শুধু ব্যবসায়িক প্রবণতায় সীমাবদ্ধ নয়। বরং আমাদের জীবনের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে এই পুঁজিবাদ। এ পুঁজিবাদ ব্যবস্থা আমাদের শিখায়, যেকোনো মূল্যে আমাদেরকে হতে হবে ভোক্তা, কেননা এই জীবনের সুখ আর উদ্দেশ্য একমাত্র ভোগে আর উন্নতিতে। যে ব্যক্তি যত বেশি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত, যত বেশি ভোগ করবে, এ ব্যবস্থায় তার তত বেশি কদর। যদিও এ ব্যবস্থায় ধনীরা হয় আরো ধনী, গরিবরা হয় আরো গরিব, তাতে কিছু যায় আসে না।

পশ্চিমা নীতিতে আমরা দেখি ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রবণতা। এর ফলে আমাদের পরিবারেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মূলত ব্যক্তি স্বাধীনতার একটি উদ্দেশ্য হলো ভোগবাদ বৃদ্ধি। যেহেতু

পরিবারের জন্য,সমাজের জন্য মানুষ ত্যাগ করে, যা ভোগ কমায়। তাই ব্যক্তি স্বাধীনতা, নারীবাদ, সমকামিতা প্রভৃতি ব্যবহার করে তারা পরিবার ব্যবস্থা দুর্বল করতে চায়। যার ফলে তাদের মাঝে লিভ টুগেদারভিত্তিক ভঙ্গুর পরিবারও তৈরি হয়। তাদের মধ্যে কেউ কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। সবাই ভোগ করবে কেউ কারো জন্য সেক্রিফাইস করতে পারে না। এভাবে কৌশলে ভোগবাদ বৃদ্ধি করতে চায়। ভোগ বাড়লে ক্রেতা বাড়বে ,ক্রেতা বাড়লে পন্য বেশি বিক্রি হবে বেশি বিক্রি মানে বেশি মুনাফা-পুঁজিবাদ। এ ভোগ ও পুঁজিবাদের পথে যে সকল বিষয় বাধা সৃষ্টি করে যেমন ধর্ম,পরিবার,সমাজ; তারা সেই সকল বিষয়ে মুছে দিতে চায়। সকল ব্যবস্থা থেকে ধর্মকে উৎখাত, পরিবার সমাজ ব্যবস্থা দুর্বল করার যত কৌশল অবলম্বন করা যায়, তা তারা করছে। সংশয়, বিজ্ঞানবাদ, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে ধর্মকে ভুল প্রমাণ; ব্যক্তিস্বাধীনতা,নারীবাদ, সমকামিতা, লিভটুগেদার ইত্যাদির মাধ্যমে পরিবার ব্যবস্থা দুর্বল করছে। উদ্দেশ্য একটাই, ভোগবাদ বৃদ্ধি করতে হবে, পুঁজিবাদী আধিপত্য বিস্তার করতে হবে।

■ পরিভাষার মারপ্যাঁচ:

পরিভাষা বলা হয় কোন বিশেষ ঘটনা বা বিশেষ চিন্তার সাথে কোন শব্দ প্রয়োগ করা এবং সে শব্দ যখন উচ্চারণ করা হবে তখন সে শব্দের পূর্ণ মর্ম সম্বোধিত ব্যক্তির মাথায় চলে আসবে। আর প্রত্যেক জাতি বা গোষ্ঠীর নিজস্ব পরিভাষার অর্থ তারাই সবচেয়ে ভালো জানে। সেই পরিভাষাকে অন্য সভ্যতার আঙ্গিকে ব্যবহার করতে গেলে তার আসল মর্ম ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন হয়ে যায়। আর এই পরিভাষা প্রতিটি সভ্যতার জন্য এক ধরনের হাতিয়ার, কেননা এটি যেকোন সংশ্লিষ্ট মতবাদকে পাকাপোক্ত করার সক্ষমতা রাখে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা উপনিবেশিককালীন পরিভাষাকেও তাদের হাতিয়ারস্বরূপ ব্যবহার করে। তাদের মতবাদের সাথে সাংঘর্ষিক এমন ইসলামিক পরিভাষার পরিবর্তে নিজেদের পরিভাষা প্রচার করতে থাকে।

লর্ড মেকলের উক্তি-

" এই শ্রেণীর(রক্তমাংসে ভারতীয় মস্তিষ্কে ব্রিটিশ) কাছে আমরা দায়িত্ব দেব তাদের দেশের প্রচলিত কথাগুলোকে সংস্কার করার এবং পশ্চিমা পরিভাষা নিয়ে তাদের স্থানীয় ভাষাগুলোকে সমৃদ্ধ করার"-(পশ্চিমা-দর্শ-সংজ্ঞা পরিভাষা গ্রহণ ও আত্মীকরণ)

ফলে ইসলামিক সেই পরিভাষাগুলোর আসল মর্ম ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন হতে থাকে, যা মূলত পাশ্চাত্য দর্শনে পরিণত হয়। যেমন আমরা যেদিন থেকে খিলাফাহ, ইমারাহ, শরিয়া যাওয়ার পরিবর্তে সেকুলারিজম ও গণতন্ত্র চাওয়া শুরু করেছি, সেদিন থেকেই খিলাফাহ,ইমারাহ শব্দগুলো জঙ্গিবাদের সমার্থক হয়ে গেছে। মূলত কোন শব্দকে তার পারিভাষিক অর্থ থেকে বের করলে ভয়ঙ্কর ফেতনা সৃষ্টি হয়। যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"এমন এক সময় আসবে যখন আমার উম্মতের কিছু মানুষ মদকে ভিন্ন নাম দিয়ে পান করবে।"-(ইবনে মাজাহ, কিতাবুল ফিতান: ৪০২০)

■ খিলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্ত ও পশ্চিমা গণতন্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণ:

ইউরোপ ধর্মের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করেছে ঠিক, আমরাও তাদের অনুসরণে ইসলামকে ত্যাগ করেছি। যা ছিল আমাদের পূর্বসূরীদের মুকুট স্বরূপ।
পাশাপাশি গ্রহণ করেছি তাদের সভ্যতা, তাদের নারীর মতো আমাদের নারীদের স্বাধীনতার শিক্ষা দেয়া হয়, ইউরোপ ধাঁচের রাষ্ট্রব্যবস্থা গণতন্ত্র,বিজ্ঞান দর্শন, তাদের মতো সমাজ পরিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিয়েছি।

অথচ আমাদের ইসলামই ছিল পরিপূর্ণ।ইসলাম আমাদের একইসাথে শেখায় আধ্যাত্মিকতা, আত্মশৃঙ্খলা, সমাজ জীবন,অর্থ ব্যবস্থা,রাষ্ট্রনীতি,যুদ্ধনীতি আইন বিচার।ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে এমন ব্যবস্থাপনা তৈরি হয়, যেখানে দ্বীনি সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে,ধর্মীয় অনুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, আখেরাতের সফলতা অর্জন করা সহজ হবে, মানুষ যুহদ ও অল্প তুষ্টির গুণ অর্জন করবে। এগুলোই মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য আর ইসলামের দৃষ্টিতে একেই উন্নতি বলা হয়। শরীয়ত শুধু জান মালের নিরাপত্তা নয় বরং একজন ব্যক্তির তার সন্তানকে যিনা থেকে,পাপাচার থেকে, সমাজে প্রচলিত নানা অপরাধ থেকে বাঁচাতে পারছে কিনা ইসলামে এটাও নিরাপত্তার অংশ। শরীয়তের বাইরে কোন কিছু গ্রহণ করাই মানে জমিনে ফ্যাসাদ ও জুলুম প্রতিষ্ঠা করা। অধিকার

সময়ে সঠিক সংরক্ষণ একমাত্র ইসলামী শরিয়াই করতে পারে। পৃথিবীতে শান্তি-নিরাপত্তা তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে, যখন ইসলামী শাসন চালু হবে এবং কুফরি(তাগুতি) ব্যবস্থা বন্ধ হবে। কেননা ইসলামী একমাত্র মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা দেখে, আর কুফরি ব্যবস্থার পথ আমাদের ইহকালীন জীবন ধ্বংসতো করেই,সাথে জাহান্নামে পথে পরিচালিত করে।

আমাদের উত্তরসুরিদের বিপ্লবী আদর্শ ও পবিত্র জিহাদের মাধ্যমে ইসলামী শাসন কায়েম করেছিল। খেলাফত হারানোর পরও মুসলিমরা নানাভাবে এ বিষয়গুলোতে উন্নত করার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পশ্চিমা শাসন ও সামরিক শক্তি ফ্যাসিবাদ এগুলোকে ধ্বংস করে দিয়েছে, এর ফলে হাজারো মুসলিম আলেম বিজ্ঞানী গুপ্ত হত্যার শিকারও হয়েছে।পশ্চিমারা তাদের ঐতিহাসিক ঘটনা পঞ্জিকে ইসলামবিদ্বেষের মোড়কে সাজিয়ে নিয়েছে। অন্যান্য ভিনদেশী ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে তাদের যে অবস্থান,তার পুরোপুরি আলাদা অবস্থান শুধুমাত্র ইসলামের ক্ষেত্রে।

আমরা আমাদের এই ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক খিলাফাহকে ত্যাগ করে, পশ্চিমা নীতির এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা গ্রহণ করেছি, যাতে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন স্থান নেই, আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মতামতের মূল্য নেই।যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সুদভিত্তিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। যে ব্যবস্থা নারীবাদ,মানবতাবাদ ও বিবর্তনবাদের মতো উদ্ভট নীতি বাস্তবায়ন করে।

গণতন্ত্র! নামটি শুনতে যদিও মনে হচ্ছে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার, কিন্তু এর পেছনে সকল নিয়ন্ত্রণ একশ্রেণীর ধনী কর্পোরেটদের হাতে। এরাই সেই পুঁজিবাদী গোষ্ঠী, যে প্রার্থী তাদের এই পুঁজিবাদ ব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে বেশি অনুকূল, তারাই মূলত নির্বাচিত হয়ে থাকে। এই পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মাধ্যমেই ইসলামী পরিবেশ সংকীর্ণ হয়ে আসছে, এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ইসলামের দৃষ্টিতে বরং অবনতি।

অথচ মধ্যযুগে যখন খ্রিস্টান ও যাজক ও জমিদাররা জনগণ ও রাষ্ট্রের জীবন দুঃসহ করে তুলেছিল, তখনো ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প সংস্কৃতি ,আইনের শাসন, নিত্য নতুন ভূখণ্ডে মুসলিমের অধিকার প্রতিষ্ঠা,নারী নিরাপত্তা ও সম্মানের অন্যান্য নজির তৈরি করেছিল।

আওড়ঙ্গজেবের শাসনে এই দেশ ছিল প্রথম অর্থনীতির দেশ, ছিল শক্তিশালী শিক্ষা ব্যবস্থা। সম্রাট আওরঙ্গজেব রাহিমাহুল্লাহর সময় ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে চীনকে পেছনে ফেলে ভারত বর্ষ পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হয়, যার মূল্যবান ছিল প্রায় ৯০ বিলিয়ন ডলার। এর জিডিপি ছিল সেই সময়ের সমগ্র বিশ্বের চার ভাগের একভাগ। (Angus Maddison,The World Economy,OECD Publishing-2003,Page:261)

যেখানে আমাদের উচিত ছিল সব সময় শরিয়া কায়েমের জন্য সর্বাত্মক যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং মরণপণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করার প্রবণতা থাকার কথা, সেখানে আমরা আমাদের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা ত্যাগ করে, গ্রহণ করছি আল্লাহ তায়ালার সাথে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী এক রাষ্ট্রব্যবস্থা, যা আমাদের ইহকালীন জীবনতো ধ্বংস করছেই, সাথে পরিচালিত করছে জাহান্নামের দিকে।

সমাধানের পথসমূহ

■ কোরআনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন:

আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَقَالَتْ أُولَـٰهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

বাংলা অর্থ:

"তাদের প্রথম দল বলবে শেষ দলকে: 'তোমাদের আমাদের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ছিল না। সুতরাং তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের কারণে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর।'"-(সূরা আরাফ: আয়াত ৩৯)

আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারিমের এই আয়াতের মাধ্যমে,আমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার আসল রূপ চিনিয়ে দিচ্ছেন, যাদের আজ এক শ্রেণীর মুসলিমরা উন্নতি ও স্বাধীনতার মুল কান্ডারী হিসেবে অন্ধভাবে অনুসরণ করছে।

পশ্চিমা সভ্যতার যে আগ্রাসন আমাদেরকে ঘিরে ধরছে, হয়তো একটা সময় আমাদের সতর্ক করতে, আমাদের দিকনির্দেশনা দিতে যোগ্য কাউকে পাশে পাবো না। তবে কুরআনুল কারীম সেই সাড়ে ১৪০০বছর যাবৎ দিকনির্দেশনা দিয়ে আসছে এবং দিয়ে যাবে শেষ সময় পর্যন্ত। আমাদের ফিরে যেতে হবে কোরআনের দিকেই।

কোরআন আমাদের শেখায় আল্লহর দাসত্বেই রয়েছে মানবিক মুক্তি, অর্থনীতিতে এক আল্লাহর দাসত্বই পুঁজিবাদের থাবা থেকে আদম সন্তান রক্ষা পাবে, বিচারব্যবস্থায় এক আল্লাহর দাসত্বে ফিরে গেলে প্রতিষ্ঠিত হবে সকল নিরাপত্তা, আল্লাহর দাসত্বেই পরিবার ও সমাজে ফিরবে প্রশান্তি,সুস্বাস্থ্য ও সম্মান, কিভাবে এই উম্মতের দুর্দশা দূর হতে পারে, সে দিকনির্দেশনা একমাত্র কোরআনই দিতে পারে।কোরআনই আমাদের চেনায় আমাদের মুল শত্রু কারা,কারা আমাদের আখিরাতে সাফল্যের পথে বাধা।

তাই আমাদের উচিত কোরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করা। আরবি শেখার গুরুত্ব অনুধাবন করা, নিজে শেখা, পরিবার ও অন্যান্যদের শিখতে উদ্বুদ্ধ করা। হকপন্থী আলেমদের কাছে কোরআন বোঝা, তরজমা-তাফসির অধ্যয়ন করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের কি বলতে চেয়েছেন, কি কি দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, সে সকল বিষয় অনুধাবন করা। কেননা কোরআনেই আল্লাহ তাআলা দেখিয়ে দিয়েছেন,আমাদের মুক্তির পথ।

■ দাওয়াহ ও সুন্নাহ উজ্জীবিত:

প্রত্যেক মুসলিমের চিরস্থায়ী মিশন হিসেবে দাওয়াহকে গ্রহণ করা উচিত। বর্তমান সময়ে মানবতার জন্য এটিই এখন সবচেয়ে বড় সেবা। ইসলামের বিজয়ের জন্য আমরা যদি কিছু করে যেতে পারি, তার সুফল আমাদের মৃত্যুর পরেও পৌঁছাতে থাকবে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ইসলামী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবস্থা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। তাই শাইখ আবুল হাসান আলী নদভী রহিমাহুল্লাহ এজন্যই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বলেছেন ‘নয়া ইরতিদাদ’ বা নব্য দ্বীনত্যাগ। তাদের অনুসরণে আমাদের দুনিয়া জীবনের উদ্দেশ্য যেমন ব্যর্থ হবে তেমনি পরকাল জীবনও।

তাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত যত বেশি সংখ্যক মানুষকে ঈমানের দিকে আনা যায় এবং ইসলামের যে একটি নিজস্ব ওয়ার্ল্ড ভিউ আছে, সেটি পৌঁছে দেয়া। তাই নিজে এ সকল বিষয়ে আলিমদের তত্ত্বাবধানে ইলম অর্জন করা এবং নিয়মমাফিক কিছু সময় দাওয়াতে ব্যয় করা।আমাদের জীবনের যে একটি উদ্দেশ্য রয়েছে,তা প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেয়া।

আমরা আমাদের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন,বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশীসহ সকলের মাঝে এই সকল বিষয় প্রচার প্রসারের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারি। পাশ্চাত্য সভ্যতার ষড়যন্ত্র সমূহ নিয়ে সতর্ক করতে এবং ইসলামের সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিতে, এই সকল বিষয়ক বই,লিফলেট তাদের মাঝে বিতরণ করতে পারি, বিভিন্ন সময় এই বিষয়ে সেমিনার বা হালাকার আয়োজন, নিজস্ব এলাকায় ইসলামিক লাইব্রেরি গড়ে তুলতে পারি, মসজিদের জুম্মা বারে ইমাম খুতবার মাধ্যমে মুসল্লিদের সতর্ক মূলক বক্তব্য রাখতে পারেন।

যে ইউরোপ একসময় ইসলামের ভয়ে সন্ত্রস্ত ছিল। তারাই বর্তমানে এখন ইসলামকে অবজ্ঞার চোখে দেখে। এর মূল কারণ কখনো ইসলামী ভাবাদর্শের প্রতি তাদের সম্মান প্রদর্শনের কারণে নয় বরং ইসলামী বিশ্বের সাংস্কৃতিক দুর্বলতা এবং অনৈক্যের ফসল। আর আমাদের মাঝে এই সাংস্কৃতিক দুর্বলতা অনৈক্য প্রধান কারণ হলো নববী শিক্ষার সাথে আমাদের দূরত্ব।

অথচ নববী শিক্ষাই আজকের উম্মতের দুর্দশা দূরীকরণের একমাত্র পথ। যাকে বলা হয় সুন্নাহ। কোরআনের পর নবীজির সুন্নাহই কি হলো ইসলামী শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস।সুন্নাহ হল নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর কথা কাজ ও মনোসম্মতি মাধ্যমে আমাদের জন্য যেসব দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন সেইসব কে বোঝানো হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জীবন হল কোরআন এর জীবন্ত নমুনা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা। ইসলামকে যদি একটি ঘরের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে সুন্নাহ হল তার কাঠামো বা ভিত্তি। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যে সকল পথনির্দেশনা দিয়েছেন তার প্রাসঙ্গিকতা আমাদের বোঝার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। কোন ক্ষেত্রে যদি আমরা তা বুঝতে নাও পারি, কখনো সে সকল আদেশ মেনে চলতে হবে। যে সকল বিষয় প্রচলিত যৌক্তিকতার মানদন্ডে ফেলা যাবে না। এর নামই ঈমান।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
অর্থ: "তোমার রবের কসম! তারা কখনোই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিবাদে তোমাকে (হে মুহাম্মদ ﷺ) বিচারক হিসেবে মানে এবং তুমি যে সিদ্ধান্ত দাও তাতে তারা তাদের অন্তরে কোনো সংকীর্ণতা অনুভব না করে — বরং পূর্ণ সন্তুষ্টির সঙ্গে তা মেনে নেয়।"-সূরা আন-নিসা — আয়াত ৬৫

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন:
قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ,قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

"বলুন: তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে আমাকে অনুসরণ করো—তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।বলুন: আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না।"-সূরা আল ইমরান: **৩১**,৩২

আমরা যেদিন থেকে দিন ও সুন্নাহতে ফিরে আসবো এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ বাদ দেব- সেদিন থেকে আমরা এগোতে পারবো ইহকালীন পরকালীন সাফল্যের দিকে, এর এর দ্বারাই ইসলাম আবারও বিশ্বে সমুন্নত হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

অর্থ: "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ—তার জন্য, যে আল্লাহ ও পরকালে আশা রাখে"-(সূরা আহযাব; আয়াত: ২১)

■ পরিবারে দ্বীনশিক্ষা জোরদার:

মানুষের ধর্মের প্রতি বিশ্বাস অবিশ্বাস বেশিরভাগ নির্ভর করে তার পরিবেশের উপর।
যেমনটা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রতিটি নবজাতক ইসলামের ফিতরাতের উপর জন্ম লাভ করে। এরপর তার মা-বাবা তাকে ইহুদি,খ্রিস্টান বা অগ্নি পূজারী হিসেবে গড়ে তোলে।-(সহিহ বুখারী;১/১২৭৫)

একটি শিশুর মূলত পারিবারিক জীবন, স্কুল, সমাজ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল বেশিরভাগ মুসলিম পরিবার এই পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত। এ সকল পরিবারে দ্বীনচর্চার অবস্থা খুবই শোচনীয়। পাশাপাশি তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাও ব্রিটিশ প্রণোদিত।ফলে এই সকল পরিবারের শিশুরা তাদের মূল শিকড়ের সাথে পরিচিতও হতে পারে না। তাদের ইসলাম,তাওহীদ, আকিদা ইত্যাদির প্রাথমিক জ্ঞান ও থাকেনা। তাদের মন মস্তিষ্কে বিরাজ করে পশ্চিমাদের জীবন আচার।

অথচ সন্তান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এক বিশেষ নেয়ামত ও আমানত। সন্তানদের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীতে এমন সাদকায়ে জারিয়া রেখে যেতে পারি, যাদের মাধ্যমে আমরা মৃত্যুর পরও নেকি হাসিল করতে থাকবো।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
"যখন মানুষ মারা যায়, তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ছাড়া...
...একজন নেক সন্তান যে তার জন্য দোআ করে।"
— সহিহ মুসলিম 1631

"উত্তম সন্তান সাদাকায়ে জারিয়া।"-(মুসনাদু আহমাদ: ৮৪২৫)

কোরআন ও হাদিসের বিভিন্ন জায়গায় পরিবার ও সন্তানকে ইসলামী আদর্শ,ঈমান,আখলাক শেখানোর জোর তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। সন্তানকে দ্বীনি শিক্ষা দেয়া শুধু মা-বাবার উপর দায়িত্ব নয়,বরং এটি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রত্যেক পিতা-মাতার উপর এক ন্যস্ত আমানত। যার ব্যাপারে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট জবাবদিহিতা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।"
— সূরা আত-তাহরীম 66:6

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থ বিষয় সম্পর্কে জবাবদিহি করবে...
পুরুষ তার পরিবারের নেতা—তার পরিবার সম্পর্কে জবাবদিহি করবে।"
— সহিহ বুখারি 893, সহিহ মুসলিম 1829

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের উত্তম আদব শিখাও।"

— সুনান ইবনে মাজাহ 3671 (হাসান)

“তোমরা তোমাদের সন্তানদের সাত বছর বয়সে সালাতের নির্দেশ দাও...”
— সুনান আবু দাউদ 495

সুতরাং আমাদের উচিত আমাদের পরিবারের সদস্য এবং শিশুদের মাঝে দ্বীনি শিক্ষা জোরদার করা। এজন্য আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নিতে পারি, যেমন: বাড়িতে ইসলামিক লাইব্রেরী তৈরি, সাপ্তাহিক তালিম, শিশুদের বিভিন্ন ইসলামিক গল্প শোনানো, গল্পের মাধ্যমে তাদের ইসলামের ইতিহাস গুলো তুলে ধরা, আমল-আখলাক শেখানো, আল্লাহ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ইসলামী বিধি বিধানের প্রতি ভালবাসা তৈরি করা। পরিবারের সদস্য ও শিশুরা যখন এগুলো শিখবে-তখন তারা প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে জানবে, ইসলামের প্রকৃত শত্রুদের চিনবে এবং তারাই পরবর্তীতে এই সকল শত্রুদের সকল ষড়যন্ত্র ও কৌশল রুখে দিবে।

■ নারী অধিকার নিশ্চিত:

বর্তমানে ফেমিনিজম বৃদ্ধির পেছনে পাশ্চাত্যের আগ্রাসনের পাশাপাশি ইসলামপ্রদত্ত নারী অধিকার সমূহ বাস্তবায়নে আমাদের চরম অবহেলাও দায়ী। পার্শ্ববর্তী শিরকি সমাজের প্রভাব এবং ইসলাম পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠিত না থাকার কারণে আমাদের সমাজে এমন কিছু প্রথার প্রচলন আছে যা ইসলাম অনুমোদন করে না, অথচ সাধারণ মুসলিমরা এগুলো ইসলামী নির্দেশনা হিসেবে পালন করে আসছে।

নারীদের মোহর, সম্পদের মিরাস ও স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব ইসলামের আবশ্যকীয় বিধান। কিন্তু আমাদের সমাজের নারীরা এই সকল বিষয়ে চরম অবহেলার শিকার। প্রায় স্বামীরা স্ত্রীদের মোহর আদায়ে গড়িমসি করে, অনেকে স্ত্রীর ভরণ পোষণকেই মোহর হিসেবে গণ্য করে থাকে।এই বিধান যেন সমাজ থেকে প্রায় বিলুপ্তই হয়ে যাচ্ছে। নারী-পুরুষ প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ তাআলা সম্পদের মিরাস নির্ধারণ করে দিয়েছেন।অথচ এক্ষেত্রে তারা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, বরঞ্চ নারীদের মিরাস চাওয়াকে নির্লজ্জতা ও ঘৃণার চোখে দেখা হয়। স্ত্রীর ভরণপোষণ স্বামীর উপর ওয়াজিব, এক্ষেত্রে অনেক পুরুষ তাদের যথাযথ দায়িত্ব

পালন করছে না। যৌতুকের মতো হিন্দুয়ানী প্রথা নারীদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, যা ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। আর এই যৌতুকের জেরে অনেক নারীকে সহ্য করতে হয় অকথ্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। এছাড়াও আরও নানা ধরনের কুসংস্কৃতির ফলে নারীরা সমাজে নানাভাবে বঞ্চিত হচ্ছে।

ইসলামে এই সকল কর্মকান্ড সম্পূর্ণ হারাম এবং জুলুম হিসেবে বিবেচিত। তবে অনেক সাধারন মুসলমান এগুলোকে ইসলামী নির্দেশনা বলে ভেবে আসছে। ফলে অন্যায় ও অত্যাচারের শিকার অনেক নারী ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় এবং ঝুঁকে পড়ে পাশ্চাত্যের তৈরি নারীবাদের মতো বস্তাপচা ধারণার দিকে।

তাই আমাদের দায়িত্ব ব্যক্তি জীবন, পরিবার ও সমাজ থেকে এই সকল কুসংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো,ইসলামপ্রদত্ত নারী অধিকার গুলো নিশ্চিত করা।পরিবার-সমাজের সকলের মাঝে এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করা। পশ্চিমা নারীবাদের সমালোচনা তখনই অর্থবহ হবে,যখন এর পাশাপাশি ইসলামপ্রদত্ত নারী অধিকারসমূহের প্রতি আমরা সচেতন হবো, নয়তো তা হবে একপ্রকার ডাবল স্ট্যান্ডার্ড।

■ পাশ্চাত্য দ্বারা প্রভাবিত ইসলামিক স্কলার-আলেম থেকে সতর্ক:

বর্তমানে এক শ্রেণীর ইসলামিক স্কলার পাশ্চাত্য সভ্যতার কাছে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পরাজয় বরণ করে নিয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার নানা চিন্তাধারা ও মতবাদ , যা ইসলামে নিষিদ্ধ, তা ইসলামাইজেশন করতে নানা ধরনের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছে। এ সকল ব্যাখ্যার আদৌ কোন অস্তিত্ব পাওয়া যায় না সালাফদের যুগেও। অনেক সময় তারা চাইলেও সঠিকটা তুলে ধরতে পারেন না,কেননা সেখানে সমস্যায় পড়তে পারেন। এ সকল ব্যাখ্যা সাধারণ মুসলিমদের মাঝে প্রচার-প্রসারের ফলে তৈরি হচ্ছে মডারেট মুসলিম কমিউনিটি, যা শরিয়ার শিক্ষাকে পাশ্চাত্য দর্শনের মানদন্ডে বিচার করে।

আমাদের সাধারণ মুসলিমদের এ সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে হবে এবং এ সকল আলেম ও ইসলামিক স্কলারদের চিহ্নিত করতে হবে । তাদের এই সকল ব্যাখ্যাকে খন্ডিত করে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে প্রচার করে সতর্ক করতে হবে। ইসলাম বুঝতে হলে পূর্ববর্তী অর্থাৎ যে সময় ইসলাম বিজয়ী ছিল, তখনকার আলেমদের বক্তব্য আমাদের নিতে হবে। বর্তমান সময়ের আলিম ও স্কলারগনের কথা যদি পূর্ববর্তী স্কলারদের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে তা গ্রহণ করা যাবে না।

কেননা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "আমার যুগের লোকেরাই সর্বোত্তম ব্যক্তি(যারা আমাকে দেখেছে-সাহাবী),অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী(তাবিয়িন), অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী (তাবি তাবেঈন)।এরপর আসবে মিথ্যা কসম ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার যুগ।"-(সহিহ বুখারী: ২৬৫২)

■ ইসলামের নিজস্ব পরিভাষা সমূহের প্রচলন:

উপনিবেশিক শক্তিগুলো যখন মুসলিম দেশগুলোতে খেলাফত ব্যবস্থা ধ্বংস করছিল, তখন তারা ইসলামী পরিভাষাগুলোর পরিবর্তে নিজেদের পরিভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে।এ বিষয়ে লর্ড মেকলের উক্তি থেকেও এটি প্রমাণিত হয়-

" এই শ্রেণীর(রক্তমাংসে ভারতীয় তবে মস্তিষ্কে ব্রিটিশ) কাছে আমরা দায়িত্ব দেব তাদের দেশের প্রচলিত কথাগুলোকে সংস্কার করার এবং পশ্চিমা পরিভাষা নিয়ে তাদের স্থানীয় ভাষাগুলোকে সমৃদ্ধ করার"-(পশ্চিমা-দর্শন-সংজ্ঞা পরিভাষা গ্রহণ ও আত্মীকরণ)

আমরা যখন ইসলামী পরিভাষাগুলো ত্যাগ করে তাদের পরিভাষাগুলো গ্রহণ করতে শুরু করলাম, তখনই মূলত ইসলামের বিভিন্ন মতবাদ আমরা পাশ্চাত্যের দর্পণে বিবেচনা করতে শুরু করি। কেননা পরিভাষা এমন একটি ফ্যাক্ট, যা কোন মতবাদকে পাকাপোক্ত করতে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। আর এর ফলে ইসলামী পরিভাষার মর্ম হারিয়ে যায় এবং ভিন্ন উদ্দেশ্য উপস্থাপন করে।

তাই আমাদের উচিত পাশ্চাত্যের মোকাবেলায় ইসলামের নিজস্ব পরিভাষাগুলো গ্রহণ করা এবং মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়া। ইসলাম সর্বক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যুতার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে,

পারলে অন্য সভ্যতার প্রতিটি বিষয়েই বৈপরীত্য রাখার কথা বলা হয়েছে। এজন্য মক্কার কাফেররা রেগে গিয়ে বলতো-এই লোক (মুহাম্মদ) কি চায়! সে তো এমন কিছুই বাদ রাখছে না যেখানে সে আমাদের বিরোধিতা করছে না।-(সহিহ মুসলিম-৩০২)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের কোন বিধানের জন্য পাশ্চাত্যের পরিভাষা বা শব্দের ব্যবহার এবং পাশ্চাত্যের কোন বিষয়ের জন্য ইসলামী পরিভাষার ব্যবহার পছন্দ করেননা। আমাদের সালাফগণও গ্রিক কিংবা রোমান সভ্যতার কোন বিষয়ের জন্য ইসলামী পরিভাষা প্রয়োগ করেননি এবং নিজস্ব পরিভাষাও কখনো বর্জন করেননি। কেননা এটি দ্বীনের বিকৃতি ঘটায় এবং পশ্চিমা মতাদর্শগুলো আমাদের কাছে সার্বজনীন করে তুলে। এর ফলে মূলত আমাদের নিজেদের মতাদর্শগুলোই হারিয়ে যাবে।

■ অন্যান্য মতাদর্শের সাথে সামঞ্জস্যতার মনোভাব দূরীকরণ:

এক শ্রেণীর মুসলিম আছে যারা ইসলামকে পাশ্চাত্যের দর্পণে বিচার করে দেখে, পাশ্চাত্য স্বাধীনতা,সমতা উন্নতির আলোকে,ইসলামকে পর্যালোচনা করে।পাশ্চাত্যের দর্শন ও আদর্শের মাপকাঠির দর্পণে, মানবীয় জ্ঞান ও আকলের দ্বারা ইসলামী বিধানের ভালো মন্দের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে।যে পাশ্চাত্য দর্শনের মুল লক্ষ্যই হল আল্লাহ ও তার দীনের বিশ্বাস ও বাস্তব ক্ষমতা থেকে মুসলিম উম্মাহকে বিচ্যুত করা এবং আল্লাহই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার যোগ্য তা অস্বীকার করানো।মূলত তাদেরকে মডার্নিস্ট বলা হয়। যে সকল আয়াত ও হাদিসের বিধান সমতার দৃষ্টান্তে এসেছে, সে সকল আয়াত হাদিসের অপব্যবহার করে পাশ্চাত্য সমতাকে ইসলামিক করার প্রয়াস চালায় মডার্নিস্টরা। তারা অন্যদের কাছে ইসলামের বিভিন্ন বিধানে কাটছাঁট করে উপস্থাপন করে। তারা ইসলামের এমন এক নতুন ভার্সন আবিষ্কার করতে চায় যা পাশ্চাত্যের সাথে হবে সামঞ্জস্যপূর্ণ, হোক তা ঈমান ও কুফরের সাথে সাংঘর্ষিক। ইউরোপ সভ্যতা এদেরই সাহায্য করে এবং ফান্ডের মাধ্যমে,প্রচারের মাধ্যমে সাধারণ মুসলিমদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে।

পশ্চিমা সভ্যতার ফেতনায় মুসলিমরা ধীরে ধীরে ইসলামকেই প্রত্যাখ্যান করে বসছে। তবে এই ইসলাম ত্যাগের ক্ষেত্রে, কেউ ধর্মত্যাগের ঘোষণাও দেয় না, গির্জায়ও যায় না, মন্দিরেও যায় না

বরং তাদের ওই মতবাদসমূহকেই ইসলামিকরণের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। অতঃপর সাধারণ মুসলিমদের ঘরে ঘরে এই সকল ঈমানবিধ্বংসী মতবাদ গেড়ে বসছে।
যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইসলাম এর সাথে সরাসরি সাংঘর্ষিক, যেমন নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে পুঁজির উপর সুদ ধার্য করা, যৌনতার পরিপূর্ণ বৈধতা, পতিতাবৃত্তি ও উশৃংখলতা ইত্যাদি বিষয়ও তাদের কাছে মামুলি বিষয় হয়ে গিয়েছে । যা আমাদের পরিবার ব্যবস্থাকে দুর্বল ও ভঙ্গুর করে দিচ্ছে।

ইতিহাস প্রমাণ করে যে, যখন কোন জাতি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস,আকিদা ও দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যশীল করার চেষ্টা করেছে, সেই জাতির মাঝে নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও আমলের কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি।
নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
“যে ব্যক্তি কোন কম কে অনুকরণ করবে,সে তাদেরই দলভুক্ত।”

আমাদের কর্তব্য হলো যারা ইসলামকে কৌশলে ও অপপ্রচারের মাধ্যমে বিতর্কিত করতে চায়,তাকে আপোষহীন ভাবে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরা। ইসলাম ও দ্বীনের শত্রু কারা তা হিকমাহর সাথে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে। যে সকল মুসলিম ব্যক্তি ইসলামের হূদুদ,জিহাদ,খিলাফাহ, ওয়ালা বারা ইত্যাদির ব্যাপারে ধোঁয়াশা সৃষ্টি করে তাদের থেকে নিজেদের অন্য মুসলিমদের সতর্ক করা। ইসলামকে নিজেদের খেয়ালখুশি মোতাবেক নয় বরং শরীয়ার অকাট্য দলিলের আলোকে বোঝা। পাশ্চাত্য সভ্যতার বিরুদ্ধে লড়তে হলে আমাদেরকে তাদের ভাষায় কথা বললে চলবে না বরং এতে তাদের সভ্যতারই উন্নতি হবে। আমাদের কথা বলতে হবে আমাদের নিজস্ব ভাষায়।

আমাদের বুঝতে হবে যে, ইসলামকে যেমন বাইবেল বা অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থ দ্বারা জাস্টিফাই করা যায় না, ঠিক তেমনই পাশ্চাত্যের দর্শন-বিজ্ঞান দ্বারা ইসলামকে যুক্তিযুক্ত করতে গেলে ব্যক্তি বিভ্রান্তের পথেই অগ্রসর হবে। যেমনটা ঘটেছিল মুতাঝিলাদের সাথে। ইসলামী ইতিহাসে মুসলিমদের মাঝে গ্রিকদর্শনের প্রভাবে একটি ভ্রান্ত দলের উৎপত্তি হয়েছিল। তাড়াতাড়ি যুক্তিবিদ্যা মাধ্যমে ইসলামের মাপকাঠি বিবেচনা করতে শুরু করেছিল। ফলে তারা একসময়

ইসলামের অনেক অকাট্য বিশ্বাস ও কর্মকে নাকচ করতে শুরু করেছিল। তখনকার আলিমগণ তাদের কালজয়ী খেদমতের মাধ্যম এই ভ্রান্ত মতবাদের নির্মূল করেন। এই ভ্রান্ত গ্রিক সভ্যতার আধুনিক রুপই হল বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা। আমাদেরকে ইসলাম বুঝতে হলে কোরআন হাদিসের আলোকে এবং যোগ্য শিক্ষকের কাছ থেকে ইলম নিতে হবে। তবে এর থেকেও জরুরী হলো, আগে আমাদের ঈমানের উপর মেহনত করা এবং আমাদের পরাজিত মানসিকতা দূর করা। এই বিশ্বাস রাখা যে,ইসলামের সকল বিধান আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমেই প্রমাণিত ও আল্লাহ তায়ালার হিকমাহ ও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত, যার অনেক কিছুই মানবীয় জ্ঞান সীমানার বাইরের বিষয়।আমাদের সভ্যতার প্রধান উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়া এবং তাকওয়া অর্জন করা। মনুষ্যত্বের মৌলিক গুণাবলী বজায় রাখতে মানুষ তখনই সক্ষম হবে যখন সে স্রষ্টার তাওহীদকে উপলব্ধি করতে পারবে এবং তার বিধানের সামনে নিজেকে সমর্পণ করে দেবো।আল্লাহ সুবহানাল্লাহু ওয়া তা'আলা ও তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাধ্যমে শরীয়তের যা যা নির্ধারিত হয়েছে, তাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এর বাইরে সমস্তকার্যক্রম জুলুম ও অবাধ্যতা হিসেবে গণ্য হবে।মানুষের প্রণয়ন করা মতামত,রীতি-নীতি ও প্রথার দিকে না ঝুকে,আমাদের ফিরতে হবে আল্লাহ তাআলার বিধানে।

আমাদের উচিত মানুষের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নয়, বরং শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্টির জন্য ইসলামকে উপস্থাপন করা, তাই ইসলামের কোন বিধানকে কাটছাট কিংবা পাশ্চাত্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল করে উপস্থাপন না করে , আপসহীন ভাবে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের রূপ তুলে ধরা। আমাদের এটি বিশ্বাস করতে হবে যে হেদায়াত আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। আল্লাহ তায়ালা যার হেদায়েত চান তার কাছে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম এর রূপ প্রকাশ পেলে তারা এমনিতেই এটাকে সত্য ও ইনসাফ বলে বিশ্বাস করবে। আর যাদের হেদায়েত আল্লাহ তায়ালা চান না কেবল তারাই এসব গোঁড়ামি ও বাড়াবাড়ি মনে করবে।

■ মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার:

মুসলিম দেশগুলোতে আজকাল যেভাবে একপাক্ষিক শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে, সেখানে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ ও ধ্যান-ধারণা অতি সহজেই যুবক-যুবতী ও অপরিপক্ক মনমগজে স্থান করে নিচ্ছে।পাশ্চাত্যের শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক দর্শন ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষা ব্যবস্থা নবীজির বার্তার প্রতি মুসলিম যুবকদের আস্থাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এদের বুদ্ধিভিত্তিক জগতটাই ধর্মবিদ্বেষী। ইসলামী সভ্যতার প্রতিনিধি হিসেবে তৈরি হওয়ার যে ধর্মীয় চেতনা সেই আকাঙ্খাই তারা নষ্ট করে ফেলতে চায়।

তবে পশ্চিমা শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে মুসলিমদের আপত্তি জানানোর উদ্দেশ্য আদৌ এই নয় যে,ইসলাম এ ধরনের জাগতিক শিক্ষার বিরোধী। বরং ইসলাম জ্ঞান অর্জনে সর্বোচ্চ উৎসাহ প্রদান করে। কোরআনে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা নানান জায়গায় আমাদের জ্ঞান অর্জনের উৎসাহ প্রদান করেছেন। যেমন- “যাতে করে তোমরা জ্ঞানবান হতে পারো", “যাতে তোমরা চিন্তাভাবনা করো", “যাতে করে তোমরা জানতে পারো" ইত্যাদি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
“ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ।”-(ইবনু মাজাহ: ২৬৯৯)

উপনিবেশ আমল শুরু হওয়ার আগে ওসমানী অধীন এলাকা সময়ে একটা শক্তিশালী শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। উইলিয়াম হান্টার তার ইন্ডিয়ান মুসলমানস গ্রন্থে লেখেন-

“এ দেশটা আমাদের হুকুমতে আসার আগে মুসলিমরা শুধু শাসনের ব্যাপারেই নয়, শিক্ষাক্ষেত্র ছিল ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি। ভারতের যে প্রসিদ্ধ ইংরেজ রাষ্ট্রনেতা তাদের ভালোভাবে জানেন, তার কথায়: ভারতীয় মুসলিমদের এমন একটা শিক্ষা প্রণালী ছিল, যেটা আমাদের আমদানি করা ব্রিটিশ প্রণালীর চেয়ে নিম্ন হলেও, কোনক্রমে ঘৃণার যোগ্য ছিল না। তার দ্বারা উচ্চ স্তরের জ্ঞান বিকাশ ও বুদ্ধি বৃদ্ধি পরিচ্ছন্ন হতো। সেটা পুরনো ছাঁচের হলেও তার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় ছিল এবং সেকালের অন্যসব প্রণালীর চেয়ে নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট ছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থার কারণে তারা সহজেই আর্থিক প্রাধান্য অর্জন করতে পেরেছিল।”

তবে আমাদের এই জ্ঞান অর্জনও দ্বীনের মূলনীতি মেনে করতে হবে। এক্ষেত্রে কখনোই পশ্চিমাদের দর্পণে জ্ঞান ও দর্শনকে যাচাই করা যাবে না। ঈমান টিকিয়ে রাখতে চাইলে ইসলামের আখিরাতমুখী সভ্যতাকে বস্তুবাদী পুঁজিবাদী কিংবা তাদের চিন্তা চেতনা দিয়ে বদলানো যাবে না। আমাদের গবেষণা হতে হবে ইসলামী চিন্তা ধারার আলোকে, পশ্চিমাদের মানদন্ডকে মেনে নেওয়া যাবে না। আমরা পশ্চিমাদের শিক্ষা বিষয়ক উপকরণ ব্যবহার করে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চা করতে পারি,তবে মুসলিমদের শিক্ষা ব্যবস্থায় কখনোই তাদের দর্শনকে ঠাঁই দেওয়া যাবে না। মুসলিম গবেষকরা তাদের গবেষণাগুলোতে নিজেদের চিন্তাশক্তি ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির বদৌলতে উপসংহারে পৌঁছতে হবে।

ইসলামকে শতভাগ গুরুত্ব দেয়,এমন একটি আদর্শ শিক্ষা বোর্ডকে সিলেবাস প্রস্তাব করেছেন মোঃ আসাদ রহিমাহুল্লাহ। তিনি বলেছেন:

“পাশ্চাত্যের বুদ্ধি ভিত্তিক অর্জনের মধ্য থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান আর গণিত যেন মুসলিমদের স্কুলগুলোতে শেখানো হয়। অবশ্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বেলায় উল্লিখিত আপত্তি ও আমলের রাখতে বলবো। আর বর্তমান কারিকুলামে ইউরোপ দর্শন সাহিত্য এবং ইতিহাস চর্চার যে প্রাধান্য রয়েছে সেটা বাদ দিতে হবে।”

পশ্চিমারা তাদের ইতিহাস এমনভাবে উপস্থাপন করেছে যে,পাঠক ভাববে, পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্যই বোধহয় পৃথিবীটার জন্ম হয়েছে, বাদবাকি সকল সভ্যতা কে থরে থরে সাজানো হয়েছে পশ্চিমাদের গুনগান করার জন্য। তাই মোহাম্মদ আসাদ রাহিমাহুল্লাহ প্রস্তাবনা রাখেন:

“মুসলিম স্কুলগুলোতে প্রভাব বিস্তারকারী ইউরোপীয় সাহিত্যকে ঝেটিয়ে বিদায় করতে হবে।সেখানে নিয়ে আসতে হবে ইসলামী সাহিত্য। যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সংস্কৃতির গভীরতা ও প্রাচুর্য দেখে উজ্জীবিত হয়। এই চিন্তা চেতনা প্রবেশ করাতে পারলে, ইসলামী সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করবে।”

“মুসলিমদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইতিহাসের সিলেবাস সংশোধন করার উদ্যোগ নিতে হবে। এটা যে গরুর দায়িত্ব তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা ইতিহাসের ধারাকে ঢেলে সাজাতে পারব। নতুন করে পৃথিবীর ইতিহাস রচিত হওয়ার পূর্বেই, ইতিহাসকে দেখতে পারব মুসলিমদের আয়নায়।" -(Islam At the Crossroads: ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাত)

মূলত পশ্চিমাদের সমস্ত ধ্যান ধারণার চাইতে ইসলামের রীতিনীতি আরো বহু গুণে শ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণ। যেমন পাশ্চাত্য সভ্যতা এখনো বর্ণবাদী ও জাতীয়তাবাদীর মত সংকীর্ণ মানসিকতা লালন করে। কিন্তু ইসলাম বর্ণবাদী ঘৃণার চোখে দেখে। ইসলামে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রাধান্য দেয়া হয়, বর্ণবাদী কিংবা জাতীয়তাবাদীর মত উদ্ভট বিষয়ের ভিত্তিতে নয়।
তাই আমরা পশ্চিমাদের কাছ থেকে কেবল তাদের নির্ভেজাল ও প্রায়োগিক বিজ্ঞান গ্রহণ করতে পারি, তবে যেন এই জ্ঞান আহরণ আমাদেরকে ইসলামী সভ্যতার চাইতে পশ্চিমা সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে প্ররোচিত না করে। মানবজাতির উৎকর্ষতার সর্বোচ্চ জুড়ে পৌঁছতে হলে ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে। ইসলামকে সমুন্নত করতে অবশ্যই পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ বাদ দিতে হবে।

■ ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মৌলিক অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ:

বর্তমানে আমরা ইসলামের চিন্তা ধারা ত্যাগ করে পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়ছি, এর একটি মূল কারণ হলো ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা নিয়ে আমাদের জ্ঞানের অভাব। যখন আমরা ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস, দর্শন ও উদ্দেশ্য নিয়ে জ্ঞান আহরণ করব, তখনই আমরা অনুধাবন করতে পারবো একমাত্র ইসলামই এনে দিতে পারে আমাদের চূড়ান্ত সাফল্য, পাশ্চাত্য সভ্যতা নয়। বরং এই সভ্যতা পরকালীন জীবনের পাশাপাশি ইহকালীন জীবনকেও ধ্বংসের মুখে নিপতিত করছে।

পশ্চিম সভ্যতা যে বিজ্ঞান,স্বাধীনতা সমতা, উন্নতির নামে আমাদের মাঝে ষড়যন্ত্রকারী কিছু মতবাদ প্রসার করতে চায়, আমাদের উচিত এই সকল মতবাদের বিরুদ্ধেই তাদের প্রশ্নের সম্মুখীন করা। সেজন্য আমাদের নিজেদেরকেই ইসলামের মৌলিক অবস্থানের পাশাপাশি পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস ও বুনিয়াদ,তাদের কাঠামো,তাদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য,তাদের চালিকাশক্তি ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তবেই আমরা তাদের প্রমাণ করতে পারব,তারা যে বিজ্ঞানকে তাদের প্রভু ও চির সত্য মনে করে, যে বিজ্ঞানবাদ আল্লাহর সাথেই যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং তার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করে,
সেই বিজ্ঞান কেন বিশুদ্ধ ও চূড়ান্ত মাপকাঠি নয় এবং বিজ্ঞান কিভাবে পক্ষপাতদুষ্ট। তাদের বুলি আওড়ানো সমতা,স্বাধীনতা,উন্নতি কেন ন্যায় এবং নিরপেক্ষ নয়। আর এরই মাধ্যমে আমরা

প্রমাণ করতে পারব ইসলামী কেন একমাত্র হক ও ন্যায়। কেবল ইসলামই পারে বাতিল ও জুলুমকে প্রতিহত করতে।প্রতিষ্ঠিত করতে পারব ইসলামের মাপকাঠি।

পাশ্চাত্যের কাছে সমস্ত ভালো মন্দের মাপকাঠি আকল বা যুক্তি। যুক্তি ও সমাজকে তারা খোদার আসনে বসিয়েছে। তারা ধর্মকে ততটুকুই গ্রহণ করে যতটুকু সমাজ ও তাদের যুক্তির সাথে খাপ খায়, এছাড়া বাকি সব তারা প্রত্যাখ্যান করে এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন করে থাকে। তারা আল্লাহর স্থানে মানুষকে আর নবী রাসূলের শিক্ষার স্থানে আকল কে বসিয়েছে। মোটকথা তারা খায়েশের গোলাম তথা নফস পূজারী, অথচ তারা খায়েশ পূরণ করার নেশায় নিজেদের সর্বস্বাধীন বলে দাবি করে।

আর ইসলামে আল্লাহর দাসত্বই হলো মূল বিষয়।ইসলাম যেকোনো ভালো মন্দের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলাম ও মানুষকে গোলামীতে আবদ্ধ করতে চায়, তবে সে গোলামী কোন মানুষের নয়, বরং প্রকৃত মালিকের। ইসলাম কখনোই অনেকগুলো কল্যাণের ধারণার মধ্যে একটি দাবি করো না,বরং ইসলাম নিজেকে একমাত্র সত্য ও কল্যাণ হিসেবে ঘোষণা করে। এছাড়াও ইসলাম মানুষের ফিতরাতগত কোন চাহিদাকেই অস্বীকার করে না, বরং শরীয়ার সীমারেখার মধ্যে থেকে, তাকে সব ধরনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।দুনিয়ার জীবনকে যথাযথ ভাবে কাজে লাগানোর ব্যাপারটিকে একমাত্র ইসলামের দ্বারাই সম্ভব।

বর্তমানে প্রাচ্যবিদদের প্রচলিত যে সকল ইতিহাস দর্শন আমাদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছে, তা মুসলিমদের বিভ্রান্ত করার পেছনে শক্ত ভূমিকা পালন করছে। আমাদের উচিত ইসলামের ইতিহাস পাঠে শুদ্ধতা যাচাইয়ের মাধ্যমে যে উসুল ও মূলনীতি রয়েছে, তা অনুসরণ করে ইতিহাস পাঠ করা।

সেকুলারিজম মূলত সকল ধর্ম সরিয়ে নিজস্ব একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে চিন্তার বিষয় হলো,এই মানব সৃষ্ট ধর্মটি, দুনিয়াতে এত ধর্ম থাকা সত্ত্বেও কেন কেবল ইসলামের সাথেই তাদের এত সংঘর্ষ?

এর প্রধান কারণ আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই জানিয়েছেন সেই ১৪০০ বছর আগে।

তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

"ইসলামের বিরুদ্ধে সমস্ত কুফরি শক্তি একজোট।" -(মুয়াত্তা ইমাম মালেক; হাদিস নং-৭২৮)

এছাড়াও অন্যান্য সকল ধর্ম নির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ, সেগুলোতে জীবনের সামগ্রিক দিকনির্দেশনা নেই। ফলে সে সকল ধর্মের সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, যা জীবনের প্রতিক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দিয়েছে। মানব জীবনের এমন কোন বিষয় নেই,যার ব্যাপারে শরীয়ত বৈধতা বা অবৈধতার আদেশ-নিষেধ জারি করেনি। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার মতাদর্শ,ইসলামে অনুপ্রবেশের সুবিধা করতে পারেনা। ফলে ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিক এবং আদর্শিক দ্বন্দ্ব তৈরি হয় এবং ইসলামের উপর আঘাতটা বেশি করে।

আমাদের উচিত ইতিহাস, দর্শন,সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, উদ্দেশ্য,ফল এবং বাস্তবতার ভিত্তিতে পাশ্চাত্য নিয়ে জ্ঞান অর্জন করার। পাশ্চাত্যের মৌলিক আকিদা না জানার কারণে আমরা নানান সমস্যার শিকার হচ্ছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল ভিত্তি ও উদ্দেশ্য সমূহের জ্ঞান না থাকার ফলে তাদের প্রতি এক আপোস নীতি অবলম্বন করে চলছি এবং ধীরে ধীরে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক দাসে পরিণত হচ্ছি। তাই আমাদের উচিত ইসলামের সাংস্কৃতিক অবস্থানে থেকে তাদের মৌলিক আকিদা ও উদ্দেশ্য স্পষ্ট রূপে বুঝে নেয়া।

উপসংহার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “শীঘ্রই এমন ফিতনা আসবে যা অন্ধকার রাতের টুকরোর মতো হবে; একজন মানুষ সকালে মুমিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে — দুনিয়ার সামান্য লাভের বিনিময়ে তার দ্বীন বিক্রি করে দেবে।”-(তিরমিযী, হাদিস নং 2195)

এ হাদিস বর্তমান পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ফিতনার সাথে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সেই সাড়ে ১৪০০ বছর আগেই সতর্ক করেছিলেন। বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসনে আমাদের পরিবার ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়া, মূল্যবোধের পতন ও পরিচয় সংকট যেন সেই ফিতনারই প্রতিচ্ছবি।

মুসলিম পরিবারব্যবস্থা মূলত ইসলামী নীতিমালা, নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা এবং পারস্পরিক দায়িত্ববোধের সমন্বয়ে গঠিত।ইসলামী পরিবার ব্যবস্থা তাকওয়ার ভিত্তিতে গঠিত হয়,ফলে স্বামী স্ত্রী, পিতা মাতা,সন্তান সকলে পরস্পরের সম্পর্ক ও হক আল্লাহ তাআলার বিধান মোতাবেক যথাযথভাবে পালন করে। ইসলামের আদর্শে গঠিত পরিবারের মাধ্যমে তৈরি হয় আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা, মজবুত হয় দ্বীন। আর এই দ্বীন হল পাশ্চাত্যদের প্রধান শত্রু, এই দ্বীনই তাদের সকল এজেন্ডা বাস্তবায়নের পথে একমাত্র বাধা। তাই তারা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত, প্রযুক্তিগত ও মিডিয়াভিত্তিক আধিপত্যের মাধ্যমে বিভিন্ন কৌশলে তাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, আত্মতৃপ্তি ও স্বাধীনচেতা ইত্যাদি চিন্তাচেতনা মুসলিমদের মাঝে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের মূল লক্ষ্য এ সকল চিন্তা চেতনা মুসলিমদের মাঝে ঢুকিয়ে তাদের পরিবারব্যবস্থা-সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংসের মাধ্যমে দ্বীনকে নির্মূল করা।

কয়েক যুগ থেকে এখন পর্যন্ত মুসলিমদের কেউ কেউ এ আগ্রাসন বুঝতে পেরেছে ঠিকই কিন্তু মুসলিমদের অধিকাংশই এখন সেই পাশ্চাত্য ফিতনার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। মুসলিমদের প্রতিটি ঘর পাশ্চাত্য ফেতনায় আক্রান্ত। বর্তমানে এক শ্রেণীর মুসলিম একদিকে তারা ইসলামের বিশুদ্ধ ও সঠিক অবস্থান সম্পর্কে অজ্ঞ হয়ে বসে আছে কিংবা সে অবস্থানকে যেন প্রত্যাখ্যান করছেন নানা অজুহাতে। অপরদিকে পাশ্চাত্য জাহিলিয়াত সম্পর্কে তারা একেবারেই বেখবর।

তাই আমাদের প্রথমে যা করতে হবে, নিজেদের দ্বীন সম্পর্কে বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জনে গুরুত্ব দেয়া। ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতা কি, এদের প্রভাব কি ভালোভাবে বোঝা। মুসলিম সমাজের ভেতর পাশ্চাত্যের ছাপ তথা মডারেশন থেকে মুক্ত দ্বীনের প্রকৃত ইলম ও শরয়ি মূলনীতি মেনে বুদ্ধিবৃত্তিক ও আপসহীন দাওয়াহ ছড়িয়ে দেয়া। আমাদের মনেপ্রাণে এই বিশ্বাস দৃঢ় রাখতে হবে যে,ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্বশেষ জীবন ব্যবস্থা, যা আমাদের কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছে।আমাদের অবশ্যই ইসলামের দিকেই ফিরে যেতে হবে; ইসলাম ছাড়া আমাদের ব্যক্তিজীবন ও পারিবারিক জীবনে কখনোই প্রকৃত শান্তি আসতে পারেনা, আর না খুলবে উম্মাহর মুক্তির পথ। ইসলামই পারে আমাদের পরিবার, ব্যক্তিত্ব ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর দুর্দশা দূর করতে এবং ইহকাল-পরকালে চূড়ান্ত সাফল্য দান করতে।